প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী আভা দাস, এম্. এ., বি. টি.
চারু প্রকাশ
৭এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমলয় দত্ত
মুদ্রালিপি প্রেস
১৮এ রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়		পৃষ্ঠা

সাধারণ সম্পাদকের নিবেদন

'সংস্কৃত-কথানক-মঞ্জরী'র প্রথম প্রসূন হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত 'সেক-শুভোদয়া' প্রকাশিত হলো। এতে খুব আনন্দ অনুভব করছি। কালক্রমে আরও অনেক সংস্কৃত কথানকের অনুবাদ প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি।

সংস্কৃত সাহিত্য তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য কথানক-মঞ্জরীতে সুসমৃদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যে বহু আখ্যান ভাগ আছে, যা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে, যদিও আমরা পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী, বিশ্বামিত্র-শতদ্রু-বিপাশা প্রভৃতি গল্পের সংগে সুপরিচিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ সাহিত্যে নানা কথা প্রসঙ্গে নানা ধরণের আখ্যানের অবতারণা আছে। আমরা বৃত্রাসুর, কিম্পুরুষ, শুনঃশেপ প্রভৃতি আখ্যানভাগের সংগে সুপরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের 'মনুমৎস্যকথা' বিশ্ববিশ্রুত। এ ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনী আছে, যা আজও খুব উপাদেয়। মান্ধাতা, যযাতি, ধুন্ধুমার, নল, নহুষ প্রভৃতি কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য কেন, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যও নানা ধরণের আখ্যান-উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে, বৌদ্ধ ও জৈনরা গল্প সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী। 'জাতক' বা 'জাতকট্‌ঠকহা', 'মহাবস্তু', 'ললিতবিস্তর', 'জাতকমালা', 'পজ্জচুড়ামণি', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি বাদ দিলেও পালিভাষায় অনেক গল্প আছে, যা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। জৈনরাও আগমগ্রন্থ বহির্ভূত অনেক গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। জৈন আগম গ্রন্থের টীকাকারগণ কোন বিশেষ ধরণের পৌরাণিকী বার্তাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য এক একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। জৈনদের টীকাস্থিত গল্পের অনেক সঙ্কলনও বেরিয়েছে।

অবশ্য জৈন বা বৌদ্ধ গল্পের শেষ পরিণতি ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনায়। সম্প্রদায়গত মনোভাব বাদ দিলেও এসব কাহিনী গল্প হিসেবে খুবই উপভোগ্য।

কিন্তু উপরে উল্লিখিত গ্রন্থে যে সব গল্পের অবতারণা তা মূলতঃ প্রাসঙ্গিক, অর্থাৎ মূল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্য ঘটনার সমাবেশ। পরবর্তী কালে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালিভাষায় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধরা বহু গল্প সাহিত্য রচনা করেছেন। নানা ধরণের গল্পে, নানা ধরণের মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করে তাঁরা যশস্বী হয়েছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'হিতোপদেশ' ছাড়া যে সব গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলো 'শুকসপ্ততি', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' বা 'বিক্রমচরিত', 'চতুর্বর্গচিন্তামণি', 'পুরুষ পরীক্ষা', 'ভোজপ্রবন্ধ', 'উত্তমকুমার-চরিতকথা', চম্পকশ্রেষ্ঠিকথা', 'পাল-গোপালকথা', 'সম্যক্ত্ব-কৌমুদী' প্রভৃতি। পৈশাচীভাষায় লিখিত অধুনা লুপ্ত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র সার অবলম্বনে বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' রচিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। কথা সংগ্রহ-সাহিত্যের মধ্যে মেরুতুঙ্গের (১৩০৬ খৃঃ) "প্রবন্ধচিন্তামণি' এবং রাজশেখর সূরির (১৩৪৮ খৃঃ) 'প্রবন্ধকোষ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এছাড়াও আর এক জাতীয় ছোট গল্পের সমন্বয়ে পৃথক একটি গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, যার একটি নাম 'কথানক' সাহিত্য। এজাতীয় সাহিত্যের মূল উদ্গোক্তা হলেন জৈন সম্প্রদায়।

'কথানক' (কথ্ + আনক, উণাদিসূত্র (৩·৮২) "আণকো লূধূশিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ", তুলনীয় 'আভাণক') শব্দের অর্থ 'ছোট গল্পের ঝুড়ি' "কথা'র অর্থাৎ ছোট গল্পের 'আনক' অর্থাৎ 'পেটিকা' বা 'ঝুড়ি'। সংক্ষেপে 'ছোট গল্পের সংগ্রহ'। 'কথানক' শব্দটি সাহিত্যে প্রচলিত থাকলেও আলংকারিকগণ সাহিত্যের বিভাগ হিসেবে এর কোন

উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অগ্নিপুরাণে (৩৩৭·২০) গদ্যসাহিত্যের বিভাগরূপে 'কথানিকা', 'পরিকথা' ও 'খণ্ডকথা'র উল্লেখ আছে। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে (৩·৭) শেষোক্ত দু'টির সহিত 'সকলকথা' যোগ করেছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। জৈনদের কথানক সাহিত্য অবশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। তাঁরা 'সংগ্রহ'অর্থেই এর ব্যবহার করেছেন সাহিত্যে।

জৈনরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে বহু গল্প, কাহিনী, আখ্যান ও উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে ভারতীয় কথানক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কেবল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় কেন, আধুনিক প্রান্তীয় ভারতীয় আর্য-ভাষাতেও, যেমন, প্রাচীন গুজরাতী, রাজস্থানী ও হিন্দী প্রভৃতিতে, জৈন গল্পের এক অভাবনীয় সঙ্কলন দেখা যায়। এমনকি, প্রাচীন তামিল ও কন্নড় ভাষাতেও তাঁরা গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। জৈনদের এই সঙ্কলন সাহিত্যকে সংক্ষেপে 'লোক-সাহিত্য'ও বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে এসব সাহিত্যের রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। গদ্য বা পদ্য এজাতীয় কাহিনীর গতি পথের বাহন। কথা প্রসঙ্গে এখানে দু'একটির নাম উল্লেখ করছি মাত্র। কিন্তু যারা বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী সেরূপ কৌতূহলী পাঠককে আমার সম্পাদিত প্রাচীন রাজস্থানী ভাষায় লিখিত মানসাগরের (১৬৯০ খৃঃ) 'কান্হড় কঠিয়ারা রী চৌপঈ' র ভূমিকা পড়তে অনুরোধ করছি।

এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে জৈনদের মধ্যে জনপ্রিয়, গদ্যে লিখিত 'কালকাচার্য-কথানক'ই প্রাকৃত কথানক সাহিত্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এ কাব্যের রচয়িতা ও তার সময় সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। এ কাব্যটি সাধারণতঃ কল্পসূত্র পাঠের শেষে জৈনরা আবৃত্তি করে থাকেন। রাজা কালক কি ভাবে জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন, তা বিশদভাবে একাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী

কালে রাজা কালককে নিয়ে বহু 'কালকাচার্য কথানক'ও রচিত হয়েছে। এ-সকল 'কথানক-সাহিত্য' 'কথাকোষ সাহিত্য' নামেও বিশেষভাবে পরিচিত। হরিষেণাচার্যের (খৃঃ ৯৩১-৩২) 'বৃহৎ কথা-কোষ' (সংস্কৃতে), শ্রীচন্দ্রের (খৃঃ ৯৪১-৯৯৬) 'কথাকোষ (অপভ্রংশে), দশম শতাব্দীতে ভদ্রেশ্বরের প্রাকৃতে লেখা 'কথাবলী', রাজশেখরের 'প্রবন্ধ কোষ' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। সোমচন্দ্রের (১৪৪৮ খৃঃ) 'কথামহোদধি'তে ১৫৭টি গল্প আছে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায়। হেমবিজয়গণির (১৭০০ খৃঃ) 'কথারত্নাকর' ২৫৮টি গল্পে লিখিত এক বিশাল সংগ্রহ সাহিত্য। এ বইটি মূলতঃ সংস্কৃতে লেখা হলেও এতে মহারাষ্ট্রী, অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দী ও গুজরাতী ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া, আরও বহু গ্রন্থ আছে, যাতে অপূর্ব ও অদ্ভুত গল্পের সমাবেশ আছে। এদের মধ্যে বর্ধমান সুরির শিষ্য জিনেশ্বর সুরির 'কথাকোষ' (২০৯টি গাথায়), দেবভদ্রের (১১০১ খৃঃ) 'কথাকোষ', শুভশীলের 'কথাকোষ (অপভ্রংশে), সারঙ্গপুর-নিবাসী হর্ষ-সিদ্ধগণির 'কথাকোষ', বিনয়-চন্দ্রের 'কথাকোষ' (১৪০টি গাথায়), দেবেন্দ্রগণির 'কথামণিকোষ' এবং অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির 'কথার্ণব', 'কথাবলী', 'কথাসমাস' প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালিভাষায় এরূপ যে সব গল্প আছে, তা সঙ্কলন করে প্রকাশ করার ভার নিয়েছে চারু-প্রকাশ। এ সম্ভারের নাম দেওয়া হয়েছে 'সংস্কৃত-কথানক-মঞ্জরী'। এর প্রথম প্রসূন বর্তমান গ্রন্থ। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ খুব সরল, সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে বলে মনে করি। আশা করি, অনুবাদ পড়েও পাঠকসমাজ মূল বইয়ের রসাস্বাদনে সমর্থ হবে। এ অনুবাদ মূলের মতই রসাল। একে মূল বই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তী প্রসূনে অধ্যাপক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অনেক গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ন-সঙ্কলনে'র সংগে যারা পরিচিত তারাই জানেন ওঁর অনুবাদ কত প্রাঞ্জল ও রসস্নিগ্ধ।

'সেক-শুভোদয়া'র প্রকাশিকা শিক্ষিকা শ্রীমতী আভা দাস মহাশয়াকে হার্দিক ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ তিনি এ জাতীয় সম্ভারের পরিকল্পনায় ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। প্রধান শিক্ষক শ্রীসুকুমার দাস মহাশয় এ বই প্রকাশ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এঁরা দু'জন এই গল্প সাহিত্যের প্রকাশ ব্যাপারে উৎসাহ না দেখালে, এ জাতীয় ব্যয়বহুল অথচ নিঃস্বার্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে 'সংস্কৃত-কথানক-মঞ্জরী' প্রকাশ করা কখনও সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা এ প্রকাশনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে বক্তব্য, এ অনুবাদ পড়ে যদি পাঠক সমাজ আনন্দ লাভ করেন, তাহলে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম সার্থক ও চারু-প্রকাশের পরিকল্পনা সফল।

প্রাক্‌কথন

ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমিতে সেক-শুভোদয়া একটি মূল্যবান গ্রন্থ। স্বেচ্ছাকৃত তথা অজ্ঞতাজনিত অসংখ্য ব্যাকরণ-ভুলে ভরা এই গ্রন্থ সাহিত্যবিচারে মান্যগণ্য না হলেও মধ্যযুগের গৌড়বঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং অপরিণত বাংলা ভাষার বালখিল্য পরিবেশে এক প্রশংসনীয় দুষ্কর্ম। সেক-শুভোদয়া নামকরণের অর্থ সেকের শুভ আবির্ভাব বা আগমন। জনৈক ধর্মপ্রাণ ইসলামের তুরস্ক থেকে বঙ্গে আগমন, বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে আলাপ ও তাঁর রাজসভায় মর্যাদা লাভ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সার্বজনীন বিশ্বাস ও প্রীতি উৎপাদন এবং বিভিন্ন স্থানে ভূমিদান গ্রহণ ও মসজিদ নির্মাণের বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণিত। আরবী সেক (রূপান্তরে সেখ, শেক বা শেখ) শব্দের অর্থ—মহম্মদের দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ধর্মগুরু, মহামান্য মুসলমান, ধর্মপ্রাণ ইসলাম, ইসলাম ধর্মাবলম্বীর উপাধি প্রভৃতি। সুফী, পীর, দরবেশ প্রভৃতি উপাধিতেও এদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। হিন্দু মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত ও বৌদ্ধ থের-থেরীর মতো ইসলাম ধর্মে ও সাহিত্যে সুফী-দরবেশ-পীর পীরানীর বিশেষ ঐতিহ্য বর্তমান।

গৌড়-বঙ্গের বাইশ-হাজারী মসজিদে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে কাগজের পুঁথিতে লেখা সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংগৃহীত ছিল। ধর্মসভা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে স্থানীয় লোকজনদের উপস্থিতিতে মসজিদের নামাজীরা রোগজ্বালা নিরাময়, আপদ-বালাই নিবারণ এবং সুখশান্তির জন্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে ঐ পুঁথি পাঠ করতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে পুঁথিটি উদ্ধার করা হয়। মূল পুঁথিটি জীর্ণ এবং স্থানে স্থানে খণ্ডিত থাকায় তার একটি প্রতিলিপি করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মণীন্দ্রমোহন বসু কায়স্থ পত্রিকায় (১৩২০-২১ সাল) বঙ্গানুবাদসহ ১৩শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। তারপর হৃষীকেশ গ্রন্থমালা ১১শ সংখ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখবন্ধসহ সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকাটিপ্পনীসহ সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে (১৯৬৩) সুকুমার সেনের সম্পাদনায় গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত।

পূর্বোক্ত পুঁথির প্রতি পরিচ্ছেদের পুষ্পিকায় গ্রন্থকাররূপে হলায়ুধ মিশ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীতে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম প্রভাবশালী ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরূপেও হলায়ুধ মিশ্র চিত্রিত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বিবরণ থেকে জানা যায়—'প্রথম যৌবনে রাজপণ্ডিত, পরিণত যৌবনে লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য এবং প্রৌঢ় বয়সে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকারী, আবস্থিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ (বা মহাধর্মাধিকৃত বা ধর্মাগারাধিকারী) হলায়ুধও ছিলেন এ যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ··ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব নামে অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া আর বাকী চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা রঘুনন্দন করিয়াছেন।' (বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৭৪৩)। কিন্তু নানান কারণে বোঝা গেল গ্রন্থকারের নামটি জাল। ব্রাহ্মণসর্বস্ব পাঠ করে বোঝা যায় হলায়ুধ সেক-শুভোদয়ার রচয়িতা হতে পারেন না। তাছাড়া লক্ষ্মণসেনের কোন বিদগ্ধ সভাপণ্ডিতের হাতে এমন ভেজাল সংস্কৃত রচনা আশা করাও যায় না। অধিকন্তু গ্রন্থে উল্লিখিত উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরের রাজত্বকাল হল ১৩৩৪-১৩৭০ খ্রীঃ। গ্রন্থের পুষ্পিকায় ৬০৮ যাবনিক সন বা ১১৩৪ বিক্রম সনে সেক সাহজালালের এদেশে আগমন এবং ৬১০ যাবনিক সন

বা ১১৩৬ বিক্রম সনে এদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা উল্লেখ থাকলেও তারিখটি যথাযথ নয়, কারণ পূর্বভারতে বিক্রমাব্দ নয়, শকাব্দ প্রচলিত ছিল। সুকুমার সেনের অনুমান সেক শুভোদয়া মূল রচনাটি লুপ্ত এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি পূর্ববর্তী মূল রচনাকে অবলম্বন করে লেখা; রচনাকাল আনুমানিক ১৬শ খ্রীঃ। এখানে গদ্য ও পদ্যের চরণবিন্যাস এলোমেলো, পদ্যগুলি সব সময় পদে সাজান নয়; লেখকের স্বরচিত শ্লোকগুলি প্রায় নির্ভুল হলেও উদ্ধৃত বহু শ্লোকে ব্যাকরণগত নানা ভুলভ্রান্তি বর্তমান।

গ্রন্থকারের বিবরণ অনুসারে সেক শাহজালাল বা জলাল-উদ্‌দীন তাব্রিজ তুরস্ক থেকে বাংলায় পৌঁছে একদিন পায়ে হেঁটে গঙ্গা পার হয়ে রাজা লক্ষ্মণসেনের মুখোমুখি হলেন। ইসলাম সম্পর্কে ধর্মভীরু হিন্দুর মনে যে দ্বিধা ও সংশয় থাকা স্বাভাবিক, লক্ষ্মণসেনের মধ্যেও প্রথমে তাই ছিল। কিন্তু সেকের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, অলৌকিক ক্ষমতা ও পরোপকারিতায় তিনি তাঁর অনুগত হয়ে উঠলেন; ফলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন। রাজমন্ত্রী ও সভাসদেরা (ধোয়ী, উমাপতি ধর, হলায়ুধ প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে লক্ষ্মণসেনের সম্মুখে সেককে অপদস্থ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেক কাজেকর্মে, বিচারবুদ্ধিতে ও অলৌকিক দৈব ক্ষমতায় সবার হৃদয় জয় করলেন। রাজ্যে-রাজ্যে, রাজসভায়, শহরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই ছোটবড় সকলের বিপদ-আপদ দূর করে সেক হলেন সর্ববিঘ্নবিনাশন মহামান্য দরবেশ। রাজা লক্ষ্মণসেন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ অনেকেই তাঁকে মসজিদ নির্মাণের উপযুক্ত ভূমি দান করলেন। সেক গৌড়বঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করলেন, গরিবদের জন্য দান-খয়রাতের ব্যবস্থা করলেন এবং নিজের নাম অনুযায়ী গ্রামের নামকরণ করলেন।

সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের প্রধান চরিত্র সেকের ঐতিহাসিক পরিচয় কি? গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী শাহজালাল তব্‌রেজ

ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য তুর্কীস্থান থেকে গৌড়ে আসেন। ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে যেসব সেক বা পীর-দরবেশ ভারতে তথা বঙ্গে আসেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হজরত বায়েজিদ বিস্তামী, হজরত বাবা অদ্‌হম শহীদ, হজরত শাহ জালাল, হজরত গোরাচাঁদ প্রভৃতি। ইসলামী ঐতিহ্যে জালাল-উদ্‌দীন তাব্রিজ নামে একাধিক সেক বা দরবেশের কাহিনী পাওয়া যায়। হুসেন শাহের আমলে উৎকীর্ণ সিলেটে প্রাপ্ত একটি লিপি (রচনাকাল ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে শাহ জালাল সম্পর্কে যৎ-কিঞ্চিৎ তথ্য পাওয়া যায়। এই লিপি অনুসারে শাহ জালাল ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের পর সিলেটে আসেন। পীর সাহ জালাল পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে দিল্লীতে আসেন আনুমানিক ৭২২ হিজরী সন অর্থাৎ ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক ইবন বতুতা বাংলাদেশ পরিভ্রমণের সময় (১৩৪৬ খ্রীঃ) শয়খ জালাল তব্‌রেজী নামক জনৈক দরবেশের সাক্ষাৎ পান। অনেকের অনুমান শেখ জালাল-উদ্‌দীন তব্‌রেজী এবং শাহ জালাল একই ব্যক্তি। উক্ত শেখ জালাল উদ্‌দীন বা শাহ জালাল এবং সেক-শুভোদয়ার সেক শাহ জালাল এক ব্যক্তি নন, কারণ এই সেক লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) গৌড়ে আসেন। আলোচ্য সেক বা পীর-দরবেশদের জীবন সম্পর্কে অলৌকিকতা-পূর্ণ জনশ্রুত কাহিনী ছাড়া কোন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় না। আমাদের অনুমান গৌড় বাংলার স্থানীয় পীর দরবেশদের নামে প্রচলিত জনপ্রিয় কিংবদন্তী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কোন ইসলাম অথবা ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিন্দু কবি সেক-শুভোদয়া রচনা করে আপন গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্রের নামে তা প্রচলিত করেন।

গঠনতন্ত্রের বিচারে সেক-শুভোদয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের অনেক উপাদান যেমন বর্তমান, তেমনি সংস্কৃত কথা-

সাহিত্যের প্রভাবও কম নয়। জনশ্রুতিনির্ভর লোককাহিনী, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশপ্রসিদ্ধ কাল্পনিক কথাকাহিনী ও পশুপাখীর গল্প, পাল ও সেন রাজাদের সম্পর্কে কয়েকটি মুখরোচক গল্প-গুজব, রাজকীয় তথা উচ্চবিত্ত এবং সাধারণ সমাজের কতিপয় চিত্র, সর্বোপরি সেকের অলৌকিক অবিশ্বাস্য শক্তির মহিমাখ্যাপন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থটি বেশ আকর্ষণীয়। মা কর্তৃক ছেলের গলায় দড়ি বেঁধে কুয়ো থেকে জল তোলার গল্পটি খুব প্রাচীন; তাল-বেতালের গল্প এবং পঞ্চতন্ত্রের তুল্য পশুপাখির গল্পও আছে; ইতিহাসের ধোঁয়াটে আবরণের মধ্যে গৌড়েশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ও সভাসদ্গণের কাহিনীতে সমসাময়িক রাজসভার কিঞ্চিৎ আভাস ফুটে উঠেছে।

সেক-শুভোদয়ায় বর্ণিত সেক-কর্তৃক গৌড়বঙ্গে মসজিদ নির্মাণ এবং ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচার প্রসঙ্গে বঙ্গে তুর্কী-আক্রমণ এবং মুসলমানী আধিপত্য বিস্তারের পটভূমিকা স্মরণীয়। ১১শ শতকের প্রথম থেকেই উত্তরভারতে তুর্কী অভিযান শুরু হয়। মধ্য এশিয়ার রুক্ষ মালভূমির অধিবাসী দুর্ধর্ষ বীর তুর্কীরা উত্তরাঞ্চলের হিন্দু রাজাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও দুর্বলতার সুযোগে অতর্কিতে আক্রমণ হানতে লাগলেন। রাজ্য-লোলুপ অত্যাচারী তুর্কীরা সহজেই রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ত করলেও সম্পূর্ণ অনাহূত ও অনভিপ্রেত ইসলাম ধর্ম অতি প্রাচীন ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যময় বৈদিক বা পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উপর স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য ৮ম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই আরবী বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে ভারতে আসতে শুরু করেন এবং সম্ভবত চট্টগ্রাম বন্দরে একদল বণিকের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে ইসলাম ধর্মযাজক পীর-দরবেশ বা সুফী ভক্তদেরও অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। বিজেতা তুর্কী আক্রমণকারীদের অনেকে আবার হিন্দু-রাজ্য আক্রমণ-

এবং হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে ইসলাম প্রভুত্ব ও ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাই প্রথম পর্বে ইসলামের প্রভাব এসেছিল বলাৎকারের দ্বারা, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অথবা ধর্মীয় প্রেরণা ছিল মুখ্যত গৌণ বিষয়। ১৩শ শতকের শুরুতে যখন ইখ্‌তিয়ার-উদ্‌দীন-মুহম্মদ-বখ্‌তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণসেনের রাজধানী আক্রমণ করেন, তখন গৌড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ। সেনবংশের পূর্বে 'পরম সুগত' পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পাল ও চন্দ্র উভয় বংশই বৌদ্ধ মতাবলম্বী। উক্ত দুই বংশকে নাশ করে যথাক্রমে সেন ও বর্মণ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দুই বংশ বাঙালী না হলেও নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং তাই এদের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটল। অবশ্য পালরাজাদের ধর্মাচরণের সঙ্গে হিন্দু ধর্মাদর্শের কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল না এবং কিছুকাল পূর্ব থেকেই তন্ত্র, শাক্ত প্রভৃতি মতের হিন্দু দেবদেবী ও ধর্মসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সামঞ্জস্যের দ্বারা একাত্মতা ঘটেছিল। পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে ধর্মীয় জীবনসাধনায় বিশেষ কোন বিরোধ ছিল না। লক্ষ্মণসেনের পর গৌড়ের রাজশক্তি দুর্বল ও বিশৃঙ্খল; উত্তর-ভারতের হিন্দু নৃপতিরাও আত্মকলহে হতবল এবং অন্যত্র হিন্দু কিংবা অহিন্দু সামন্তশক্তি ছোট ছোট রাজ্যে বহুধা বিভক্ত। এই অবস্থায় বখ্‌তিয়ার কর্তৃক (১১৯৩ মতান্তরে ১১৯৭ বা ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড় বা 'সহর নোদিয়া' আক্রমণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের অনুমান ৮ম খ্রীঃ থেকেই সুফী সাধকেরা এদেশে আসতে থাকেন। ১০ম খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্মের প্রচার যে বেশ ভালোই চলছিল তার ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। সেন আমলে একদিকে ব্রাহ্মণ্য মহিমার সুউচ্চ আদর্শ, রাজশক্তিতে উচ্চবিত্ত পণ্ডিত বিদ্বানদের প্রাধান্য, সামাজিক সংস্কার

ও রক্ষণশীলতার ঐতিহ্য ছিল, ফলে শাক্ত, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের জাতিধর্মনির্বিশেষে সমানাধিকারের সার্বজনীন উদার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ স্তরের মানুষকে বিশেষত অন্ত্যজ শ্রেণীকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধদের লৌকিক দেবদেবীর মত সুফী ও পীর-দরবেশগণ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভয়ভীতির সুযোগে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই-ভাবেই হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সংস্কৃতির মিশ্র লৌকিক রূপ গড়ে উঠল।

সেক-শুভোদয়ায় বর্ণিত সেক শাহ জালালের গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ-সেনের সভায় আগমন এবং তার পরবর্তী ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, সেনবংশের আমলে গৌড়ের ইতিহাস এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির সম্পর্কে যেসব মজাদার বিবরণ পাই, তা নিছক কল্পকাহিনী নয়। সদুক্তিকর্ণামৃতের দুটি শ্লোকে রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক মুসলিম প্রভুত্ব দমনের উল্লেখ আছে ; মিন্‌হাজ উদ্‌দীনের 'তব্‌কৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের ইসলাম-বিদ্বেষের কথাও আছে। সেক-শুভোদয়ার লেখকও সেকথা স্পষ্ট করেই বলেছেন—'তত্র যো যবনো যাতি তং ঘাতয়তি'। অবশ্য সেকের আচার-ব্যবহারে এবং অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে খুশী হয়ে এই লক্ষ্মণসেনই মসজিদ নির্মাণের জন্য তাঁকে গ্রাম দান করেন—একথাও চিন্তনীয়।

রামপাল ও বিজয়সেনের গল্পে কৌতুকরস উপভোগ্য। বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী বিজয়সেন প্রথম জীবনে অনাথ গরিব শিবভক্ত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন অতি মুখরা। রামপালের গল্পে আছে যে রাজা রামপাল আপন পুত্রকে কোন স্ত্রীলোকের মর্যাদা-হানির অপরাধে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন এবং বাহান্ন বছর রাজ্য পরিচালনার পর গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেন। এই ঘটনার পর রামপালের মন্ত্রী সহদেব ঘোষ শিবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে গরিব বিজয়সেনকে সিংহাসনে বসান। কাহিনীটি নিছক কিংবদন্তী মাত্র।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্রের অন্যতম রামপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৬৯-১১২২ খ্রীঃ। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এই রামপাল এবং রামায়ণের রামচন্দ্রের কীর্তি অবলম্বনে রচিত শ্লেষকাব্য। অন্যদিকে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন ভাগ্যবলে অকস্মাৎ রাজ্য পেয়েছিলেন এমন নয়; তিনি গৌড় আক্রমণ করেছিলেন নিশ্চিত; কিন্তু কিভাবে গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করে বর্মণরাজ এবং অন্যান্য সামন্তদের নিষ্ক্রিয় করে গৌড়রাজ্য অধিকার করেন তা অজ্ঞাত। ১৪শ পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণসেনের চারিত্রিক স্খলনেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

রামপাল, বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন ছাড়া গ্রন্থে উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জয়দেব মিশ্র ও পদ্মাবতী, হলায়ুধ মিশ্র (আলোচ্য গ্রন্থের লেখকরূপে উক্ত), ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও উমাপতি ধর। এঁরা ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অমাত্য কিংবা সভাসদ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ধোয়ীর পবনদূত, গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ এবং শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, জহ্লণের সূক্তিমুক্তাবলী ও রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী নামক কোশ-কাব্যে লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও উমাপতি ধর রচিত অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। এসব শ্লোকের অধি-কাংশই আদিরসাত্মক—গোপীকৃষ্ণপ্রেম অথবা লৌকিক প্রেমের কবিতা। উমাপতি ধর ছিলেন বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী, তাঁর কবিতায় ম্লেচ্ছ রাজার সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ এবং ম্লেচ্ছ-রাজার পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেক-শুভোদয়ায় বর্ণিত কাহিনীগুলির সঙ্গে এসব কাহিনীর কোন মিল নেই; পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সেক-শুভোদয়ার কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী ও নানান লোকশ্রুতির উপর ভিত্তি করে রচিত। লক্ষ্মণসেন, তাঁর পত্নী বল্লভা, রাজশ্যালক কুমারদত্ত এবং মন্ত্রী

উমাপতি ধরের কাহিনীতে (১৬শ পরিচ্ছেদ) ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদের উল্লেখ আছে। মেরুতুঙ্গাচার্যের প্রবন্ধচিন্তামণি নামক কথানক সংগ্রহের একটি গল্পে লক্ষ্মণসেন ও উমাপতি ধরের ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ও বিদ্বেষের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু কোশকাব্যে উমাপতি ধরের শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের গুণগরিমা উচ্চ প্রশংসিত। অথচ ১৬শ পরিচ্ছেদের কাহিনীতে উমাপতি ধর ও হলায়ুধ মিশ্র (বর্তমান গ্রন্থের লেখকরূপে কথিত) কর্তৃক নির্লজ্জভাবে বারবনিতা সেবনের কথা বর্ণিত। এই পরিচ্ছেদের কাহিনীতে রাজতন্ত্রের অবক্ষয় ও উচ্চবিত্ত সমাজে শিথিল যৌনাচারের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত উপেক্ষণীয় নয়। ধোয়ীর গল্পটি (১৬শ পরিচ্ছেদ) বাল্মীকি ও কালিদাসের ভাগ্যে সরস্বতীর কৃপালাভের তুল্য। 'জগদ্‌গুরু' গোবর্ধনাচার্য ধর্মভীরু বিচক্ষণ ভালোমানুষরূপে চিত্রিত। জয়দেব-পদ্মাবতী-বুঢ়ন কাহিনীতেও কিছু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট। এখানে জয়দেব 'কবীন্দ্র' হলেও লক্ষ্মণসেনের সভায় গায়করূপে উপস্থাপিত; পদ্মাবতীও প্রসিদ্ধ গায়িকা। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে জনৈক গৌড়েশ্বরের (সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের) রাজসভায় জয়দেবের আগমনের ইঙ্গিত আছে। পদ্মাবতী নর্তকী ও দেবদাসী ছিলেন এরূপ জনশ্রুতির অনুকূলেও আলোচ্য গল্পের তথ্য মূল্যবান সাক্ষ্য। ১৯শ পরিচ্ছেদে উক্ত গাঙ্গো নট সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সদুক্তিকর্ণামৃতে নট-গাঙ্গোকের শ্লোক সংকলিত হয়েছে।

সেক-শুভোদয়ার ভাষা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যাকরণের কর্তৃত্ব নস্যাৎ করে এবং ভাষার উপর অবাধ স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়ন করে গ্রন্থ রচনা করলে তা যে সসম্মানে টিকে থাকতে পারে এই গ্রন্থ সম্ভবত তেমন বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে সংস্কৃত সন্ধি, সমাস, ধাতুরূপ, শব্দরূপ প্রভৃতির নিয়মকানুন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে (কচিৎ অজ্ঞাতসারে) উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে; তেমনি

আবার বাংলা কথ্য রীতিও সাদরে চালু করা হয়েছে। লেখক অনেক সময় বাংলা বাগ্‌ধারা এবং প্রত্যক্ষ উক্তিকে সোজাসুজি সংস্কৃতে তর্জমা করেছেন মাত্র। সহজেই বোঝা যায় গ্রন্থকার বর্ণনীয় বিষয় বঙ্গভাষায় চিন্তা করে তার সংস্কৃত রূপান্তর সাধন করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাকে 'dog sanskrit' বলেছেন; সেইমতো আমরাও একে খিঁচুড়ি ভাষা বলতে পারি। পণ্ডিতদের অনুমান সম্ভবত ইসলামী ভাবনায় অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রাণ পীর-দরবেশগণ মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুশীলিত মিশ্র সংস্কৃতের ন্যায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কথ্য বাংলার রীতি অনুসরণে এরূপ সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছিলেন। নীচে কতিপয় উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য পরিস্ফুট করা হল :

বাংলা বাগ্‌ধারার সংস্কৃত রূপ—পাপস্য ঘটকস্ত্বম্ —পাপের ঘটক তুমি (১ম); ত্বম্ অস্মাকং গৃহকথাং ন জানাসি—তুমি আমার বাড়ির কথা জান না (১১শ); স পশ্যতি ন পশ্যতি—সে দেখতে না দেখতেই (১২শ); পিত্রা সহ বিষ্ঠাং খাদয়—বাপের সঙ্গে গু খা (১৪শ); তব বক্তে ভস্ম দত্তম্—তোর মুখে ছাই (১৬শ); কাষ্ঠচয়নস্য বংশস্য মহান্ মহত্ত্বম্—কাঠকুড়ুনীর বংশের বড় বাড় (১৬শ); বারং বারং বিবদতে—বারবার বিবাদ করছে (১২শ); এমনি আরও উদাহরণ: সর্বান্ অতাড়য়ৎ (১২শ); মম অপবাদয়তে (১২শ); জলতোলায়মানে (১৩শ)।

বাংলা ধাতুর প্রয়োগ—ঢালয়ামাস, তোলয়ামাস, চৌরীকৃত্য, বধীকৃত্য, ছুরিম্ দত্বা। বাংলা শব্দের প্রয়োগ—গাল (সং গণ্ড), সাধু (সং শ্রেষ্ঠী), বাসাক (বসাক বা তাঁতি), জ্ঞানপাগলনামা, দশগণ্ডা, সুহৈ (গানের রাগ), ব্রাহ্মণী (স্ত্রী)।

ফারসী শব্দের প্রয়োগ—কাজী, গরিব, নমাজ, সেক, শিরাজ, কাফুর, জাহাজ প্রভৃতি।

বি. এন. কলেজ, ইটাচুনা, হুগলি

সেক-শুভোদয়া

এক

সেকের বঙ্গে আগমন

রাজরাজতিলক মহাত্মা মহীপাল লক্ষ্মণসেন। বিজয়ী সুশাসক রাজার মহিমা প্রশস্তিলেখগুলিতে সর্বত্র উদ্‌ঘোষিত। একদিন তিনি গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এমন সময় দেখলেন পশ্চিম প্রান্ত থেকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। সেই লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?' তারপর তিনি আরও কাছে এসে সেই প্রশ্ন করলেন। লক্ষ্মণসেন খুব চিন্তায় পড়লেন। তিনি আরও দেখলেন, লোকটি নদীর পশ্চিম দিক থেকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছেন। লক্ষ্মণসেন মাথা নুইয়ে প্রণাম করে 'গঙ্গা গঙ্গা' জপ করতে লাগলেন।

লোকটির গায়ে কালো পোশাক, মাথায় পাগড়ি, বীরের মতো চেহারা। তিনি চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে দ্রুতপায়ে পশ্চিম দিক থেকে রাজার সম্মুখে এগিয়ে আসছেন। লোকটি সেক। সেক রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কার সন্তান? এতক্ষণ আমি আপনাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও কেন উত্তর দিচ্ছেন না? সত্বর জবাব দিন।'

লক্ষ্মণসেন ও সেকের বাক্যালাপ

রাজা লক্ষ্মণসেন সেককে নিপুণভাবে দেখে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে সোৎসাহে মনে মনে বললেন, 'আজ এক অদ্ভুত ব্যাপার আমার চোখে পড়ল—এক ব্যক্তি জল থেকে উঠে জলের উপর হাঁটতে হাঁটতে আমার কাছে উপস্থিত হলেন! তাঁর দেহের এমন জ্যোতি নিশ্চয় তপস্যার প্রভাবে। তিনি আমাকে নামধাম জিজ্ঞাসা করছেন। এ তো চিন্তার ব্যাপার! কালো-পোশাক-পরা লোকটি জলের উপর দিয়ে আমার কাছে হেঁটে এলেন।' লক্ষ্মণসেন তাঁকে বললেন, 'আপনিই তো সেই লোক। তাহলে কেনই বা আপনার গুণগান করব না? আমার কথা আমি নিজে জানি। কিন্তু আপনার কথাতেও আমি খুব শ্রদ্ধা করি। কারণ অব্যক্ত শব্দ অথবা কথা শুনে পশুও তার অর্থ বুঝতে পারে। আবার হাতি ঘোড়া প্রভৃতি মানুষের ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করতে পারে। যদি বলেন কিরূপে এমন হয়, তাহলে বলি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের অনুচ্চারিত কথারও অর্থ গ্রহণ করতে পারেন, আবার মূর্খ ব্যক্তিও পরের ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারেন। নতুবা সেই পরিক্ষনগরীর কাহিনীতে লোকটির মাথা কাটা গেলেও সে বেঁচে ছিল কি করে! এতো ইন্দ্রজাল! কিছু লোক রাক্ষসের দ্বারা ভক্ষিত হয়, কিছু লোক রাক্ষসের মুখে পড়ে প্রাণ হারায়। সবই যেন মায়ার খেলা। আমি যে কথা বললাম তাতে বিশ্বাস রাখা চাই।'

তখন সেক হাত তুলে রাজাকে অভিনন্দন করে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি, যেন শরৎকালে মেঘধ্বনি। বসন্তের সুরভিতে যেমন চতুর্দিক আমোদিত হয়, তেমনি সেই হাসির ছটায় চতুর্দিক উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। সেক বললেন, 'আপনি সেনবংশ-সমুদ্ভব ভুবনবিখ্যাত সর্বজনপ্রশংসিত রাজা লক্ষ্মণসেন। এ পরিচয় স্বয়ং আপনার মুখেই পেয়েছি। মহারাজ, আপনার হাতে অস্ত্র, তাই

আপনাকে দেখে ভয় পাই। হয়তো বা ভাগ্য মন্দ, তাই মুখোমুখি এসে পড়েছি। এখন বলুন কী জানতে চান?'

এ-কথা শুনে রাজা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি পুনরায় সেককে বললেন, 'লোকে আমাকে রাজা বলে কত প্রশংসা করে, আপনিই বা তাদের মত আমার গুণগান করছেন না কেন? আমার দণ্ড-ছত্র সবই রয়েছে। যার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করি, সে তেমন ধন্য হয়; যার মাথা কাটতে চাই, তার মাথা কেটে ফেলি। তাহলে আপনিই বা রাজাকে অভিবাদন করলেন না কেন? রাজার যোগ্য সব শুভলক্ষণই আমার আছে।'

এ-কথা শুনে সেক পুনরায় বললেন, 'শুনুন, আমি ঠিকমতো আপনার পরিচয় জানি না। যদি সাধারণ লোকেও কয়েকজন গরিব মানুষকে কিছু উপহার দান করে, তখন তারাও রাজার মতো প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু আপনি স্বয়ং বলছেন যে আপনি পৃথিবীর শাসক।'

ঠিক এই সময় গঙ্গাতীরে এক বক ঠোঁটের মধ্যে একটি পুঁটিমাছ ধরে বসে ছিল। সেক সেই বককে দেখিয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি তো পৃথিবীর রাজা বলে দাবি করছেন। আচ্ছা, ঐ বককে বলুন তো মুখের মাছটিকে সে ছেড়ে দিক।'

রাজা বললেন, 'বক তো পাখি, মানুষের মতো জ্ঞান নেই। আমার কথা শুনে ও মাছকে ছেড়ে দেবে কেন? তবে আপনার যদি সে রকম ক্ষমতা থাকে, তাহলে বককে বলে মাছটিকে বাঁচান।'

সেক বললেন, 'মহারাজ, আমার শক্তি দেখুন।' সেককে দেখা-মাত্রই বক মাছটি ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাই দেখে রাজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন আর ইষ্টদেবতা দুর্গার নাম জপ করতে করতে বললেন, 'মা পরমেশ্বরী, আমায় বাঁচাও। স্বয়ং কাল সেকের রূপ ধরে আমার সামনে এসেছেন। আজ প্রাণে বাঁচব কি না সেই ভয়!' তিনি সজল মনে সেককে বললেন, 'আপনার কথা শুনে প্রত্যয়ভরেই

এমন কথা বলতে সাহস পেয়েছি। আমায় ক্ষমা করুন, আমায় অনুগ্রহ করুন। শিশু মায়ের কোলে থাকলে চাঁদকেও ভয় দেখাতে সাহস পায়, কিন্তু সেই কারণে চাঁদ তার উপর কখনো ক্রুদ্ধ হয় না।'

সেক বললেন, 'মহারাজ, আপনার কথা শুনে আমার ক্রোধ অথবা আনন্দ কিছুই হয় নি। এখন আপনি স্বেচ্ছায় যেতে পারেন, অথবা যা খুশি করতে পারেন।'

রাজা সবিনয়ে বললেন, 'যদি দয়া করেন, তবে আপনি আমার আগে আগে চলুন।' তারপর রাজা আর সেক দুজনে চলেছেন। পথে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, এই লোকটির সঙ্গে এসে ভালো করেন নি। এর গায়ে কালো পোশাক, দেখে মনে হয় যবন।'

রাজা বললেন, 'ওহে মূর্খ, এঁর যথার্থ পরিচয় না পেয়ে কেন এমন অনুচিত কথা বলছ? স্বয়ং ইন্দ্র দরবেশের রূপে দেখা দিয়েছেন।'

অতঃপর রাজা গঙ্গাতীরের সমস্ত ঘটনা মন্ত্রীকে জানালেন। কিন্তু মন্ত্রী রাজার কথা ভালোমনে গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, 'মহারাজ শুনুন, দুর্জনের সঙ্গে আলাপ না করাই ভাল। এমন চালাকি করেই উনি আপনার কাছে হাজির হয়েছেন। এখন ওকে যেখানে খুশি বিদায় দিন।'

তারপর রাজা আর মন্ত্রীর আলোচনা চলতে লাগল।

হতভাগিনী বিদ্যুৎপ্রভা

সেক পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথের মধ্যে গাঙ্গো নামক নটের পত্নী বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তার ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক বলতে একটি কাচুলি মাত্র। কোমরে ঘড়া নিয়ে বিদ্যুৎপ্রভা জল আনতে চলেছে। সেক তাকে দেখে বললেন, 'ওগো পাপিনী অবলা, শূন্য ঘড়া কোমরে নিয়ে জলকে চলেছ। হতভাগিনী, যদি আপন মঙ্গল চাও, তবে বাড়ি ফিরে যাও।'

কথা শুনে বিদ্যুৎপ্রভা মনে মনে ভাবলেন, 'এই সেক তো বিদেশ থেকে এসেছেন, আমাকে চেনেন না, তাই এমন গালমন্দ

করেছেন।' বিদ্যুৎপ্রভা সেকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারপর যদি সত্যিই আমার উপর রাগ করেন, তাহলে আপনার কথার কোন জবাব দেব না।'

সেক বললেন, 'যা বলতে চাও বল।'

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'আপনার কথার যথাযথ উত্তর খুব ভালোভাবেই দিতে পারি। তবে দরিদ্রকে এবং রাজাকে কোন কথার জবাবে কটু কথা না বলাই ভালো।' সেক আবার বললেন, 'যা বলতে চাও বল।' বিদ্যুৎপ্রভা মনে মনে একটু চিন্তা করে আরও কাছে গিয়ে বললেন, 'ওহে বিদেশী, আপনি আমার মুখের উপর বললেন যে আমি পাপিনী, কোমরে শূন্য কলসী নিয়ে জল আনতে চলেছি। বলুন, এসব কথার মানে কি?'

সেক বললেন, 'শোন, বিধাতা অনেক পুণ্যের ফলে পুরুষ করে পাঠান, আর পাপের ফলে স্ত্রীলোক করে পাঠান। তোমার জন্যই একজন ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গেলেন, আর আমি দরবেশ সেক হয়েও গ্রামের বাইরে দেবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি। তুমি কাউকে কটাক্ষ দেখাচ্ছ, কাউকে বা দুই স্তন দেখাচ্ছ। তাই তো তোমাকে পাপিনী বলে সম্বোধন করেছি, অন্য কোন কারণে নয়।'

সেকের মুখে একথা শুনে বিদ্যুৎপ্রভা হাসতে হাসতে তাঁর সামনে গিয়ে কঞ্চুক অপসারণ করে স্তনযুগল দেখালেন আর বললেন, 'এই দেখুন কেমন অমৃতের ঝরনা। ওহে মূঢ়, আপনি বৃথাই বলেছেন আমার কটিদেশে শূন্য কলসী; এখন দেখুন ভারী ভারী দুই অমৃতের ঘড়া। যদি প্রশ্ন করেন স্তন অমৃতের ঝরনা হল কেমন করে? তাহলে বলি, সর্বত্র মানুষের তিনটি দশা—বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য। শিশু মায়ের কোলে দুইহাতে ধরে মাতৃস্তন্য পান করে। দুই হাত দিয়ে মাতৃস্তন ধরে থাকে কেন? সে ভাবে হয়তো বা কেউ এসে নিয়ে পালাবে, তাই হাতে ধরে স্তন্য পান করে। আবার দেখুন, যারা

যুবক, তারা মনে মনে একথা ভাবে—মালা, চন্দন প্রভৃতি উপকরণ দেখলেও নিস্তেজ হয়ে থাকা সম্ভব, কিন্তু নারীর স্তন দেখলে যেমন উত্তেজনা, আর অন্য কিছুতে তেমন উত্তেজনা হয় না। বৃদ্ধদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু তারাও যেন এই বস্তু ছাড়তে চান না। যেমন দেখা যায়—শীতার্ত লোকেরা চাঁদের আলো পছন্দ করেন না, ঘর্মার্তরা সূর্যের আলো পছন্দ করেন না, তেমনি নারীরা বৃদ্ধ জীর্ণেন্দ্রিয় পতির সাহচর্যে মনে কোন আনন্দই পান না।' একথা বলে বিদ্যুৎপ্রভা পুনরায় সেককে দুই স্তন দেখালেন, তারপর চুল এলো করে একটি চুল তুলে নিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এই চুলটিও দুই স্তনের ফাঁকে ঢোকানো যায় না; অথচ আপনি বলছেন আমি শূন্যকলসী।... আপনি আমাকে পাপিনী ইত্যাদি কত কথায় ভৎ'সনা করলেন। আসল কারণ হল—সিংহ থেকেই সিংহের জন্ম হয়, হরিণ থেকেই হরিণের জন্ম হয়; পাপ থেকেই পাপের জন্ম হয়। আপনি কার পুত্র বলুন তো। তিন ভুবনে বিদুষী নারীই জয়লাভ করে। অথচ আপনি আমায় 'পাপিনী' বলছেন। আপনিই পাপী, পাপ থেকেই আপনার জন্ম, তাই আপনি পাপের ঘটক। আমাকে পাপিনী বলে প্রমাণ করতে চাইছেন কেন?'

সেক বুঝলেন এই স্ত্রীলোকটি অতি বাচাল। তাই তিনি চুপ করে রইলেন। বিদ্যুৎপ্রভা বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আপনি তাহলে আমাকে ভয় পেয়েছেন। কারণ অরণ্য শারঙ্গের দ্বারা, গিরিগহ্বর সিংহের দ্বারা, দিগন্ত মাতঙ্গের দ্বারা, সরোবর পদ্মের দ্বারা যথাযথ শোভা পায়; তেমনি নারী নয়ন, কটিদেশ আর স্তনের দ্বারা শোভা পায়। মহৎ ব্যক্তির মানের হানি ঘটলে হয় মৃত্যু না হয় দূরদেশে প্রস্থান করাই ভালো।'

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

সেক বললেন, 'তার কারণ যদি বিষ্ঠার মধ্যে একখণ্ড ইঁট ছোঁড়া হয়, তাহলে তার ছিটেগুলো গায়ে এসে লাগে'।

বিদ্যুৎপ্রভা ঝগড়া শুরু করলেন, 'কী আপনি আমাকে বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করছেন? একজন বিষ্ঠার মধ্যে ইঁট ছুঁড়ল, অন্য জনের গায়ে সেই বিষ্ঠা লাগল—এমন দুজনের মধ্যে আপনিই একজন। তাই ভালো মানুষ আপনাকে পথে দেখলে এড়িয়ে চলেন।'

এই সময় রাজা লক্ষ্মণসেন পাঁচজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পথে যেতে যেতে সেখানে পৌঁছালেন। বিদ্যুৎপ্রভা তাঁদের দেখেই সেককে প্রণাম জানিয়ে পালিয়ে গেলেন।

রাজমন্ত্রীর ভণ্ডামি

রাজা বললেন, 'ওহে মহাপণ্ডিত, আমাদের সঙ্গে চলুন।' সেক উত্তর দিলেন, 'মহারাজ শুনুন, আপনি প্রাসাদে ফিরে যান, আমি এখানেই থাকব; নগরে ফিরতে চাই না। আপনার নগরে যাওয়ার পথে শূন্যকলসহাতে এক স্ত্রীলোককে দেখলাম। মনে হচ্ছে অচিরেই নগর ধ্বংস হবে তাই সেখানে বেশিদিন বাস করা যাবে না। রাজা তর্ক করে বললেন, 'এখানে খুব বাঘের ভয়, তাই থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়।'

সেক বললেন, 'মালিক ছাড়া কে আমাকে মারতে পারে?' একজন মন্ত্রী রাজাকে বললেন, 'উনি গুণী লোক বলেই নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখতে পারেন। আপনি প্রাসাদে ফিরে চলুন। সেকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব'।

রাজা লক্ষ্মণসেন ফিরে গেলেন। সেই মন্ত্রী মনে মনে ভাবলেন, 'এখন তো খুব মুশকিলে পড়া গেল! কে ইনি? কোত্থেকেই বা এলেন? এঁর ডান হাতে কৃপাণ আর বাঁ হাতে আশাদণ্ড। এখানে এসে ইনি যবনের কর্ম সম্পাদন করতে চান। কিন্তু মানুষটি যে-সে লোক নন, যেন সাক্ষাৎ দেবরাজ। যা হোক, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে আজ একে বিষ খাইয়ে যমালয়ে পাঠাব।'

এরূপ চিন্তা করে মন্ত্রী সেককে বললেন, 'ওহে মহাজ্ঞানী, খাদ্যদ্রব্যের জন্ত আমাকে বলবেন। রাজা আমাকে আপনার ভোজনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।'

সেক বললেন, 'রাজার বাক্য পূর্বেই অমান্ত করলেন কেন? তাহলে পুনরায় রান্নার জিনিসপত্র এনে আমার সামনে পাক করুন।'

মন্ত্রী সেইমতো রান্নার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু গোপনে সেঁকো বিষ এনে ছয় ব্যঞ্জনের মধ্যে মিশিয়ে রাখলেন। রান্না শেষ হল। কিন্তু মুসলমান জেনে কেউই সেককে সেই খাদ্য সাজিয়ে দিতে রাজী হলেন না। সেই সময় জানা নামে এক ধোপার ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে জুয়ো খেলতে গিয়ে মায়ের দামী শাড়িটি পর্যন্ত জুয়াড়ীর কাছে বন্ধক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রস্তাব শুনে জানা মন্ত্রীকে বলল, 'মন্ত্রীমশায়, সেককে খাবার গুছিয়ে দিলে আমাকে কী দেবেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'তুমি কী আশা কর?' জানা বলল, 'যদি এক পুরান কপর্দক পাই তবে করতে পারি।'

মন্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা, তাই দেওয়া হবে; তুমি খাবার সাজিয়ে দাও।'

তারপর সেক আপন ধর্মকৃত্য নামাজ শুরু করলেন। তার আজানের শব্দ যেন আকাশ পর্যন্ত শোনা গেল। নামাজের 'হো-ও-ও' ধ্বনি উঠতে লাগল। তখন নানা লোকে নানান রকম ভাবলেন। কেউ বললেন মেঘের গর্জন হচ্ছে, কেউ বললেন গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, কেউ বললেন গঙ্গায় বানের ডাক। নামাজ শেষ হলে সেক ভোজন সমাধা করলেন। তারপর তিনি খানিকটা তেঁতুল এনে তাই ভক্ষণ করলেন।

এমন সময় হলায়ুধ মিশ্রকে সঙ্গে নিয়ে রাজা লক্ষ্মণসেন সেখানে পৌঁছে গেছেন। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, গরিবের স্বভাব

দেখুন। কোথাও এমন দেখেছেন যে খাওয়া-দাওয়া সেরে লোকে তেঁতুল ভক্ষণ করছে! এদিকে আমি কর্পূরমেশানো পান হাতে তাঁকে দেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। অথচ তিনি সেই পান নিতে গররাজী। বত্রিশ বছরেও গরিবের স্বভাব পালটায় না।'

কথা শুনে সেক রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে সেলাম। আপনার অন্ন বিষমিশ্রিত ছিল। সেই অন্ন ভক্ষণ করে মুখ তিক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই তেঁতুল খেয়েছি, অন্য কোন কারণ নেই।'

তাঁর মুখে একথা শুনে রাজা করালবদনে মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, 'ভোজনব্যাপারটি সেক ঠিকমতো বোঝেন না। ছয় রসের ব্যঞ্জন ছিল। সেক সবশেষে তিক্ত খাদ্য খেয়েছেন, তাই তাঁর মুখ তিক্ত হয়ে উঠেছে, অন্য কোন কারণে নয়।'

তার কথা শুনে সেক বললেন, 'যা হোক, হয়ত বা তেমন কিছুই হবে।'

সমস্ত ব্যাপার জেনে হলায়ুধ মিশ্র সক্রোধে মন্ত্রীকে বললেন, 'ওহে পাপবুদ্ধি মন্ত্রী, এমন কুকাজ কেউ কখনো দেখে নি, শোনেও নি। এ কেমন ব্যাপার যে বাড়িতে অতিথি এলেন, তিনি শত্রু বা মিত্র যেই হোন না, তাঁকে বিষমেশানো খাবার দেওয়া হল! তিনি না হয় ইসলামের ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, কিন্তু তবু তাঁকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। কারণ দৈবে যা ঘটবে, কেউ কখনো তার অন্যথা করতে পারে না। অতীতে একবার রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আকাশ থেকে একখানি চিঠি পড়েছিল। আবার ১১২৪ শকে বিহারপত্তন থেকে তুরস্ক বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। এই ব্যক্তি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় এবং আজানুলম্বিতবাহু। কে এমন মহাপাপী আছে যে আমার কথা অস্বীকার করে? তাই শাস্ত্রে বলে যা ঘটার নয়, তা কখনো ঘটবে না, কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটবেই। তাই স্বয়ং মহাদেবও নগ্ন আর বিষ্ণু অনন্তনাগের শয্যায় শুয়ে আছেন।'

তারপর রাজা লক্ষ্মণসেন সেককে বললেন, 'মহাজ্ঞানী, রাত্রির দেরি নেই। এখানে বাঘ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু-জানোয়ার যাতায়াত করে। সুতরাং এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

সেক বললেন, 'মহারাজ, আপনি তো শুনেছেন যে শাস্ত্রে বলে জীব যখন গর্ভে অবস্থান করে সেই সময়েই পাঁচটি বিষয়ে তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়; এগুলি হল আয়ু, কর্ম, বিত্ত, বিদ্যা আর মৃত্যু। তা ছাড়া আপনি কি প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ? তাই এখন আপনি প্রাসাদে ফিরে যান। আমি এখানেই রাত্রি কাটাব।'

রাজা লক্ষ্মণসেন বিদায় নিলেন। সেক জানার সঙ্গে সেখানেই থাকলেন।

হলায়ুধমিশ্রবিরচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে সেকের আগমন' এবং রাজদর্শন নামক কাহিনী সমাপ্ত।

দুই

যেখানে জনসভায় সকলে সেকের মহিমা শ্রবণ করেন,
সেখানে তাদের সর্ব বিঘ্ন দূরে যায়, চোরভয় নাশ হয়॥

তারপর যখন মাঝরাত্রি, তখন তিনটি বাঘ সেখানে হাজির হল। তারা ধোপার ছেলে জানাকে খাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাঘের ভয়ে জানা বাপের নাম স্মরণ করতে করতে সেকের কোলে উঠে বসল। সেক তাকে বললেন, 'ভয় পাও কেন? ওই বাঘগুলোকে কানে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

জানা বলল, 'মশায়, আমি বরং প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বাঘের কানে ধরতে পারব না।'

তারপর বাঘ-তিনটি সেককে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল। তখন জানা সুস্থ হয়ে উঠল। জানার মা ভোরবেলা নানা লোকের মুখে ছেলের খোঁজ নিতে নিতে সেখানে এসে 'হায়! হায়!' করে কাঁদতে লাগলেন। ছেলেকে দেখেই তাকে কোলে নিয়ে তিনি সজোরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

দূর থেকে লোকজন কানাকানিতে শুনতে পেলেন সেক এবং সেই ধোপার ছেলে দুজনকেই রাত্রিতে বাঘে খেয়েছে। একজন দ্রুত গিয়ে মন্ত্রীকে এ খবর জানাল। মন্ত্রী সত্বর রাজার কানে সে-খবর পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনি মহাপুরুষই দেখেছিলেন বটে। সেই মহাপুরুষ আর ধোপার ছেলে জানা দুজনেই বাঘের পেটে গেছে।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা বলে উঠলেন, 'হা হতোঽস্মি।' তিনি সেককে দেখতে চললেন। ভাবলেন, 'আমি তো বাঘের ভয়ের কথা বলেছিলাম, কিন্তু সেক সে-কথা শোনেন নি। পথে যেতে যেতে জানার মায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি স্নান সেরে ফিরছেন। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলের খবর কী?'

ধোপানী বললেন, 'ভালো আছে।'

তখন রাজা কঠোর বাক্যে মন্ত্রীকে ভৎর্সনা করে উঠলেন, 'ওহে দুষ্ট মন্ত্রী, আমার সামনে মিথ্যা কথা বলেছ! তোমাকে অবশ্যই এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর রাজা সেকের কাছে পৌঁছে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। সেকও রাজার প্রশংসা করে বললেন, 'ধন্য মহারাজ, আমার উপর শত্রুতা ভুলে প্রাতঃকালেই এখানে হাজির হলেন, সত্যিই আপনি মহান ব্যক্তি।' তারপর রাজা ধোপার ছেলে জানাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত রাতে কি হয়েছিল?'

সে বলল, 'তিনটি বাঘ এখানে হাজির হয়েছিল; কিন্তু সেককে দেখে প্রণাম করে পালিয়ে গেল।'

প্রভাকর বণিকের প্রতি অনুগ্রহ

রাজা সত্বর রাজমিস্ত্রীকে হাজির করিয়ে আদেশ দিলেন, 'আজই পাকা ইঁটের গাথনি দিয়ে একখানা বিশহাত পরিমাণ চতুষ্কোণ সাজানো বাড়ি বানাও। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাড়াতাড়ি আমার আদেশ পালন কর।'

সব কারিগর একমন হয়ে চতুঃশাল বাড়ি তৈরি করল। রাজাও কৃতার্থ হলেন। তারপর লক্ষ্মণসেন মন্ত্রীর সঙ্গে পাশাখেলায় বসলেন। কিছুক্ষণ খেলা চলার পর সেক পাশার ঘুঁটিগুলি অদৃশ্য করে সারা শরীর কাপড়ে ঢেকে মৌনী হয়ে বসে রইলেন। এই কাণ্ড দেখে রাজা অবাক। মন্ত্রী সন্দেহ করে বললেন, 'সেকের এ কেমন কাণ্ড!'

ক্ষণকাল পরেই সেক রাজাকে পাশার ঘুঁটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ দোকা আর পাঞ্জার দান ধরুন।' এই সময় সেকের সমস্ত কাপড়চোপড় জলে ভেজা দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে মহাজ্ঞানী, এ কী করেছেন? কাপড় থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে কেন?'

সেক—রাজন, আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কেমন করে?

রাজা—এমন কে আছে যে আপনার কথা বিশ্বাস না করে নিজের মৃত্যু চাইবে?

রাজার অতিশয় নিষ্ঠা দেখে সেক বলতে শুরু করলেন, "প্রভাকর নামে এক বণিক বাণিজ্য করে বহু ধনসম্পদ অর্জন করেছিলেন। একবার তিনি বড় নৌকা সাজিয়ে গভীর সমুদ্রে বাণিজ্য করতে গেলেন। সমুদ্রের মাঝখানে দৈবনির্মিত 'ত্রিশূলী' নামে একটি গাছ ছিল। সেই গাছটি বর্ষায় খুব ছোট হয়ে যেত আর গ্রীষ্মে খুব বড় হত। দৈব দুর্বিপাকে বণিক প্রভাকরের নৌকা ঐ গাছে ধাক্কা খেল। সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার সময় বণিক বারবার আমাকে স্মরণ করতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আমার উদ্দেশে এই আর্যাটি পাঠ করলেন—

মকদম সেক শাহজালাল তব্‌রেজ তব পায়ে করোঁ। পরনাম
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম।
বারেক রক্ষা কর মোর ধন-প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান।

তার মুখে এই করুণ প্রার্থনা শুনে আমার হৃদয় যেন তীরে বিদ্ধ হল। মহারাজ, সেই কারণে সারা দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে সেখানে পৌঁছালাম—যেখানে সেই বণিকের নৌকা ডুবে যাচ্ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাতাসের বেগ কমল, ততক্ষণ হাত দিয়ে সেই নৌকা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বায়ুর গতি কম হলে সবকিছুই স্থির হল। তারপর সেই নৌকা ছেড়ে আপনার এখানে হাজির হয়েছি।”

রাজা বললেন, ‘হে মহাত্মা, সমুদ্র এখান থেকে ছ’ মাসের পথ, আপনি এত দূর থেকে সমুদ্রের শব্দ শুনতে পেলেন কী উপায়ে?’

সেক বললেন, ‘রাজন্‌, অরণ্যে, প্রান্তরে, যুদ্ধে, শত্রুসংকটে, সম্পদে যে যেখানে আমার কথা স্মরণ করে, আমি তার কাছেই যাই। কিন্তু পরহন্তা, পরদারাসক্ত, অথবা চোর ডাকাত প্রভৃতি যখন ভয়ে পড়ে আমাকে স্মরণ করে, তখন তাদের কাছে যাই না।’

রাজা সেকের কথা যাচাই করার জন্য তাঁর কাপড় নিংড়ে সেই জল আগুনে ফুটিয়ে দেখলেন জল শুকিয়ে লবণ তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপার দেখে রাজা লক্ষ্মণসেন মনে মনে সেকের মহিমা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল, রোমাঞ্চ দেখা দিল। তিনি ভাবলেন, ‘স্বয়ং কাল সেকরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত।’ পাশা ফেলে রেখে তিনি অন্যত্র যাবেন বলে মনস্থির করলেন। সেককে প্রণাম জানিয়ে তিনি বললেন, ‘হে মহাজ্ঞানী, জাতি, প্রাণ, রাজ্য আর ধনসম্পদ—এই চারটি বস্তুই প্রধান। এগুলির মধ্যে জাতি ছাড়া বাকী তিনটি আপনার চরণে সমর্পণ করতে প্রস্তুত আছি। আপনি যাতে খুশি হন তাই করব। এখন আপনার অনুমতি হলে

স্বেচ্ছায় যেতে পারি।' এই বলে রাজা চুপ করে সেকের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজার মুখে এমন সকাতর আবেদন শুনে সেক তাঁকে বোঝালেন, 'মহারাজ, এমন সকাতর মিনতি করছেন কেন? আমি শুনেছি সমরবিজয়ী রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে কে এমন আছেন যে তাঁকে জয় করতে পারেন! তাহলে আপনার মুখে এমন কথা কেন! সেক গম্ভীরমুখে পুনরায় রাজাকে বোঝালেন, 'মহারাজ শুনুন, আমি সামান্য ফকির মাত্র; আপনি কেন এমন ভয় পাচ্ছেন যে আমি আপনার রাজলক্ষ্মী, ধনপ্রাণ সবকিছু হরণ করতে হাজির হয়েছি। এসব কথা খুব ধর্মবিরোধী। আপনার মঙ্গল হোক।' এই বলে সেক যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। রাজা লক্ষ্মণসেনও উঠে দাঁড়িয়ে সেককে সম্মান করে বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।'

সেক পুনরায় রাজাকে বোঝালেন, 'সব ব্যাপারেই আমাকে অগ্রভাগে স্থান দিচ্ছেন এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি যা দেখেছেন, যা শুনেছেন এবং যা বলেছেন সবই ঠিক। দূত-চারণগণ আপনার গুণকীর্তন করুক।'

একথা শুনে রাজা মনে মনে সুস্থ হলেন। সেক রাজাকে আশ্বাস দিয়ে রাজভবনে পাঠালেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জয় হোক, শুভবুদ্ধির উদয় হোক মন্ত্রীদের।
সেনাপতি বীরত্বে খ্যাত হোন আর প্রজারা দীর্ঘজীবী হোন॥

হলায়ুধমিশ্ররচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেকের আবির্ভাব-কাহিনী সমাপ্ত।

তিন

বণিক-পত্নীর কাহিনী

পরদিন রাজা লক্ষ্মণসেন পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে পাশাখেলা শুরু করলেন। খেলা চলতে চলতে রাজা দেখলেন কোন এক বণিকপত্নী পথের মধ্যে স্বামীকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের দিকে আসছেন। বণিকপত্নী স্বামীর জন্য ভগবানের উদ্দেশে কাঁদছেন। সেকও তার কান্না শুনলেন। তিনি ভেবেচিন্তে বললেন, 'আল্লার নাম নিযে যে কাঁদছে, তাকে এখানে হাজির করো।'

বণিকপত্নীকে তাঁর সামনে আনা হল। তার দিকে লক্ষ্য করে সেক দেখলেন তার হাতে ছুরিকা, আবার নিজের শাড়ির সঙ্গে স্বামীর গায়ের কাপড় বাঁধা। তাকে এই অবস্থায় দেখে সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠাকরুন, এ কেমন ব্যাপার ? কী কারণে আপনি স্বামীর সঙ্গে নিজেকে একত্র বেঁধেছেন ? বাঁ হাতে ছুরি নিয়ে কেনই বা আল্লার নামে বিলাপ করছেন ?'

একথা শুনে ধনী বণিকের স্ত্রী সেককে বললেন, 'পণ্ডিতপ্রবর, ইনি আমার স্বামী। আমরা গঙ্গায় জীবন বিসর্জন দিতে চলেছি। ওঁর পিতামাতা বাধা সৃষ্টি করে আমাকে বাঁচাতে চাইছেন ; তাই এমন ব্যবস্থা করেছি। যিনি বলপূর্বক আমাকে বাধা দিতে আসবেন, তার বুকে এই ছুরি বসিয়ে দেব। শাস্ত্রে বলে স্বামীই স্ত্রীর সতত গতি, যেমন নদীর গতি সাগর আর শত্রুপীড়িত মানুষের একমাত্র আশ্রয় হলেন রাজা। আরও দেখুন—ইহলোকে এবং পরলোকে

পতিই স্ত্রীদের একমাত্র অবলম্বন। তাই একথা বলা হয়, যে নারী স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি ষাট হাজার বছর অর্থাৎ মানুষের যত-সংখ্যক লোম ততদিন স্বর্গে বাস করেন।'

সেক বুঝলেন কী ব্যাপার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগো অবলা, আপনি এমন কথা বলছেন কেন যে আপনিও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবেন? যদি ইহজন্মের অথবা পরজন্মের পাপে সহমরণের সময় আগুনের উত্তাপে ভয়ে পালিয়ে আসেন, তখন কী হবে? ভীষণ বদনাম রটবে। জন্মান্তরের পাপ আল্লাহ ছাড়া কে বলতে পারেন?

বণিকপত্নী সেকের কথায় উত্তর দিতে যাচ্ছেন এমন সময় তার শ্বশুর সেখানে এসে তার কানে এক চড় বসিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে পাপীয়সী, রাজা মন্ত্রী সবাই রয়েছেন; তোমার এমন নির্লজ্জ স্বভাব যে এসব কথা বড়াই করে বলছ।'

বণিকপত্নী বললেন, 'আপনারা সবাই জানবেন আমার মৃত্যু হয়েছে। আর জানবেন আমি এই সেকের পদতলে শূকরীর মতো আশ্রয় নিয়েছি। রাজার বাড়িতে অনেক সুন্দরী অপ্সরা আছেন; আমি না হয় শূকরী হয়ে রইলাম। আপনারা আমার উপর হিংসা করছেন কেন?'

মন্ত্রীরা তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করে বললেন, 'ভদ্রে, সেক আপনাকে যা বললেন, আপনি তার অর্থ বুঝতে পারেন নি। যদি ভয়ানক পাপ কিছু থাকে, তাহলে এই পৃথিবীতে থেকেই আগুনে সে পাপ দগ্ধ করছেন না কেন? ভদ্রে, আপনি তো তেমন কিছু বড়াই করেন নি।'

বণিকপত্নী মন্ত্রীদের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'তাই দেখা যায়, মানুষের দোষও আছে, আবার গুণও আছে। সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষ জন্মায় না। এমন সুন্দর যে পদ্ম, তারও দণ্ড কর্কশ হয়।'

রাজসভাসদেরা বললেন, 'ভদ্রে, আত্মহত্যা করার মতো পাপ যদি আপনার ঘটে থাকে, তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করে তা থেকে মুক্তি হতে পারে। সত্য ঘটনা প্রকাশ করে পাপ থেকে শুদ্ধি লাভ করুন।'

বণিকপত্নী বলতে লাগলেন, "হে ধর্ম, তুমি সাক্ষী। শুনুন—কোন এক দিন আমি গঙ্গায় গিয়েছিলাম। স্নান সেরে এলোচুলে ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দুর্ভাগ্যবশে সেই সময় রাজার শ্যালক কুমারদত্ত রাজার দামী ঘোড়ায় চড়ে জলপান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'ভদ্রে, আমার মুখের দিকে দেখুন, আমার সেবা করুন, তাহলে আপনার যা গয়নাকড়ি আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গয়না গড়িয়ে দেব। আমাকে কথা দিন, দেখুন আমি কী না করতে পারি। সর্বদা আপনার বশে থাকব; যা বলবেন, তাই করব; যা খেতে চাইবেন, তাই খাওয়াব।' রাজ-শ্যালক এমনি নানা কথা বলতে লাগলেন। আমি রাজাকে ভয় করি, কিন্তু এই লোকগুলিকে ভয় পাই না। সেই লোকটি এতসব কথা বলল, কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম।"

তখন সে আবার বলল, 'আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন? যদি জোর করে আপনাকে ধরে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যাই, তাহলে কে আপনাকে রক্ষা করবে?'

তার অভিপ্রায় বুঝে আমি বললাম, 'ওরে মূঢ় কামান্ধ, তুমিই বা কে, আমিই বা কে? পরস্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ সর্বদা অশোভন। আমার একটিই স্বামী। তুমি তো রাজপুত্র। এই ঘটনা জানতে পেরে লোকে বলাবলি করবে এই রাজশ্যালক লোকটি পরস্ত্রীতে আসক্ত, কুকর্মা। সমাজে যার নিন্দা রটে, তার জীবন নিষ্ফল। কার এমন শক্তি আছে যে সুশাসিত দেশে পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে? এমনিতরো অনেক কর্কশ ভাষায় তাকে ভৎর্সনা করলাম।

তবুও সেই লোকটি আমাকে অনেক কাকুতিমিনতি করল। তারপর সে বলাৎকার করতে উদ্যত হল। তখন আমি কপট ছলে বললাম, 'মূর্খ, পরস্ত্রীকে কেমন করে ভোলাতে হয় কিছুই জান না।' আমি যখন এসব কথা বলছি, ততক্ষণে গ্রামের লোকেরা সেখানে এসে গেছেন। আমি তাদের সঙ্গে বাড়িতে ফিরলাম।

তবু আবার সেই রাজশ্যালক কুমারদত্ত গ্রামের নাপিত-বধূর হাতে নানা উপঢৌকন দিয়ে আর কাকুতিমিনতির কথা বলে আমার কাছে তাকে পাঠাল। একদিন সেই নাপিতানী কাজকর্ম সেরে এসে আমাকে বলল, 'ওগো সুন্দরী, কুমারদত্ত তোমার রূপযৌবনলাবণ্য দেখে যেন মরার মতো অবস্থায় রয়েছে, আমার বাড়িতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। বলেছে যে সে তোমার অধীন, তা ছাড়া নানান অলংকার দিতে রাজী আছে। তোমার জন্য আমার মারফত টাকাকড়ি আর খাবারদাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি তার উপর একটু প্রসন্ন হও। কারণ—মেঘের আবির্ভাব, খলের ভালোবাসা, নতুন শস্য, নারী, যৌবন ও ধনসম্পদ স্বল্পকাল পর্যন্তই ভোগযোগ্য থাকে।"

বণিকপত্নী এসব কথা বলতে থাকলে তার শ্বশুর তাকে নিষেধ করে বলে উঠলেন, 'দুরাচারিণী, এবার থামো; এতে কি তোমার নিজের মহত্ত্ব বাড়ছে? এর পূর্বে সবই তো বলেছ! আবার এসবের দরকার কী?'

সেক চুপ করে শুনছিলেন। তিনি বললেন, 'ওহে পাপাত্মা, তুমি ওকে নিষেধ করছ কেন? আমার সামনে ওকে বলতে দাও।'

বণিকপত্নী পুনরায় শুরু করলেন—"কী বলেছিলাম? নাপিতানী আমাকে তাই বলল। তখন আমি তাকে বললাম, 'পাপীয়সী, তুমিও সেই কাজে নিযুক্ত হয়েছ! আর সেই রাজশ্যালক এখনও এমন কামান্ধ! পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম যে ভাল হয় এমন ব্যাপার কখনো দেখি নি, শুনি নি। এর ফলে লোকনিন্দা আর অপবাদ রটে। আমার স্বামী আছেন শ্বশুর আছেন, আমাদের ধনসম্পদও অনেক। সেই লোকটি আমার কাছে অনেক রূঢ় কথা শুনে এখন তোমাকে পাঠিয়েছে! আমি কখনোই তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখব না। কারণ—যৌবন, ধনসম্পদ, প্রভুত্ব আর বিবেকহীনতা—এর সব কটিই অনর্থের মূল; যেখানে চারটির সমাবেশ হয়,

সেখানে কত না অনর্থ! যদি আবার এ-ব্যাপারে কথা বল, তাহলে তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব।' এই বলে আমি তাকে খুব রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করলাম। তখন সেই নাপিতানী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। পথে যেতে যেতে সে বলল, 'আমার শক্তি কতদূর তা জান না! এমন ব্যবস্থা করব, যাতে এদেশে বাস করতে পারবে না।' এই বলে কুমারদত্তের কাছে পৌঁছে হাসতে হাসতে সব ঘটনা জানাল এবং বলল, 'আপনার ইচ্ছা সফল হবে। আমি যে কাজে যেখানে যাই, তার অন্যথা হয় না। ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকুন।'

তার কথা শুনে কুমারদত্ত অনেক টাকাকড়ি দিয়ে তাকে খুশী করলেন। তারপর নাপিতানী কুমারদত্তকে ধীরে ধীরে বলল, 'ভবিতব্যতার আর কী কারণ থাকতে পারে! তার বাড়িতে স্বামী আর শ্বশুর রয়েছেন। তবু সেই বণিকপত্নী আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে এসব সত্ত্বেও যদি কাজ হাসিল করতে চাও, তাহলে আমার কথা শোনো—কুমারদত্ত আমার স্বামী আর শ্বশুরকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়ে অলংকার তৈরির বায়না দিন। তারপর যখন অলংকার তৈরি হবে, তখন তাদের নামে এই বলে অপবাদ দিতে হবে যে মোট সোনা থেকে আটপল পরিমাণ কম আছে। একথা বলে আমার স্বামী আর শ্বশুরকে আটক রাখতে হবে।' এই বলে নাপিতানী হাসিমুখে প্রস্থান করল।

পরের দিনে সেই কুমারদত্ত আমাদের বাড়িতে হাজির। তিনি এসেই আমার স্বামী ও শ্বশুরকে বললেন, 'ওহে বণিকরা, পিতাপুত্র আমার বাড়িতে চলুন, সোনার অলংকার গড়তে হবে। আপনারা দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাবেন।' নগদ পাঁচ মুদ্রা বায়না দিলেন। আমি স্বামী ও শ্বশুরকে নিষেধ করলাম। তাঁরা আমাকে গঞ্জনা দিয়ে চলে গেলেন। তাঁরা বণিকের বাড়িতে নানা অলংকার তৈরি করতে শুরু করলেন। কাজ শেষ হলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হল। তাঁদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হল। কুমারদত্ত

বললেন, 'আমার আটপল সোনা কম হয়েছে।' এই বলে আমার স্বামী আর শ্বশুরকে সেখানে আটক করে রাখলেন।

কুমারদত্ত পুনরায় সেই গ্রামণী নাপিতানীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'গ্রামণী, যাও যাও। তোমার মনোমত সবই করেছি; তুমি সত্বর যাও।' নাপিতানী ধীরে ধীরে যাত্রা করল। আমার কাছে পৌঁছে সে শান্তভাবে বলল, 'সুন্দরী, আমার কথা শোনো। তোমার স্বামী আর শ্বশুর দুজনেই আটক রয়েছেন। এখন সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর।'

তার কথা শুনে আমি তাকে রূঢ় ভাষায় ভৎ´সনা করলাম। তারপর ঝাঁটা দিয়ে তাড়া করলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল এবং কুমারদত্তের কাছে আমার নামে সব মিথ্যা কথা বলল। সে বলল, 'কী হল শুনুন—সেই বণিগ্‌বধ্‌ মাধবী বললেন, 'আমি কাউকে ভয় পাই না। আমার শাশুড়ী চোখে দেখতে পান না। কুমারদত্ত মধ্যরাত্রে বাড়িতে খুশিমত আসতে পারেন।'

একথা জানানো হলে কুমারদত্ত মধ্যরাত্রে আমার বাড়িতে পৌঁছালেন। আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তিনি আমার কাপড়ের আঁচলে ধরে আমার বুকে হাত দিলেন। আমি বাপ-মায়ের নাম করে জোর গলায় কান্নাকাটি করতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমি চীৎকার চেঁচামেচি করলাম। তা শুনে সব লোকজন ছুটে এল; তারা কুমারদত্তকে ধরে ফেলল এবং রাজ-মন্ত্রীকে এই সংবাদ জানাল।

মন্ত্রী বললেন, 'যা করা উচিত আমি তাই করব। কিন্তু এ ব্যক্তিটি রাজার শ্যালক; তাছাড়া রাজপত্নী স্বামীর আদরিণী। তাঁর ভাই, সুতরাং আমি একে শাস্তি দিতে পারব না। তবে শাস্তি যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। আপনারা রাজসভায় যান। আমি আপনাদের পিছনে পিছনে সেখানে হাজির হব।'

এই ব্যাপার জানার পর সকলে মিলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে

রাজসভায় গেলেন। রাজাকে প্রণাম করে সকলে অভিযোগ করে বললেন, 'হে মহারাজাধিরাজ, আপনার নাম অনুসারে আমাদের এই নগরীর নামকরণ হয়েছে। এখন এ রাজ্যে অধর্ম অনাচার ঘটে চলেছে। আপনি আমাদের অনুমতি দিন, এই রাজ্য ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলে যাই।' তাদের কথা শুনে রাজার সভাসদরা পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং নিশ্চল অবস্থায় বসে রইলেন। তারপর সর্বজনমান্য গোবর্ধন আচার্য বললেন, 'ওহে প্রজারা, কাজের কথা বল।'

তখন জ্ঞাতিকুটুম্বদের অনুরোধে মাটিতে হাত রেখে আমি সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলাম, 'শুনুন, আমি বণিকপত্নী মাধবী। কুমারদত্ত নামক এই রাজশ্যালক জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকে বস্ত্র আকর্ষণ করে আমার স্তনমর্দন করেছে। সেই সময় আমি ভয়ানক চীৎকার শুরু করে দিই; ফলে বহু লোকজন আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়। তারপর আপনাদের মাননীয় কামান্ধ রাজশ্যালক তাদের হাতে ধরা পড়েন। এখন এর যথোচিত দণ্ড বিধান করা মহামান্য আপনার হাতে নির্ভর করছে।'

আমার এই উক্তির পর রাজমহিষী বল্লভা চেটির মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজসভায় এলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আপন ভাই কুমারদত্তের বিরোধী মন্ত্রী উমাপতিধরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওহে সভাসদ্‌গণ, এই উমা-পতিধর একটি পাপিষ্ঠ। এমন কাজ তারই; এই জেনে যা কর্তব্য, তাই করুন।

রাজমহিষীর মুখে একথা শুনে মন্ত্রী চুপ করে রইলেন। রাজা আর সভাসদ্‌রাও তাঁর মতো মৌনী রইলেন। তারপর রানী আমাকেও ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন, 'বেলজ্জ, পরপুরুষলম্পটা, অসতী, তুই কার কথায় আমার ভাইয়ের নামে দোষ দিস্! যে এমন কাজ করেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই সে এর ফল পাবে। আর

আমি তোকেও এমন শাস্তি দেব যে কখনো কারো কথায় এমন কাজ করতে সাহস পাবি না।'

তখন আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, 'যা উচিত, তাই ঘটুক। তারপর কী হয় কে জানে।' আমি রানীর কাছে গিয়ে তাঁর চরণবন্দনা করে দু-চারটি কথা বললাম, 'মা, আপনি ধর্মশীলা, আমায় ক্ষমা করুন। গৌড়রাজ্যের রাজা সমরবিজয়ী মহারাজাধিরাজ শ্রীমান লক্ষ্মণসেন। আপনি তাঁরই পত্নী। আমাদের এই রাজ্যে শাশ্বত ধর্ম মান্য ছিল। কেউ কারো উপর অত্যাচার করতে পারত না। এখন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এই নিয়ম চালু হয়েছে। আপনি আদেশ করুন, আমি তাই করব। হয়তো বা আপনার পিতৃবংশে এমন নিয়ম আছে যে একে অন্যের স্ত্রীকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে পারে। তাহলে আপনি আদেশ করুন, আপনার ভাইকে সেবা করি।'

আমি একথা বললে রাজপত্নী আমাকে চুলের মুঠিতে ধরে বারবার পদাঘাত করলেন। ভয় পেয়ে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না। তখন আমি সভাসদ্‌গণের উদ্দেশে একথা বললাম—'যে সভায় বৃদ্ধেরা থাকেন না, সে সভা সভাই নয়; যে বৃদ্ধেরা ধর্মের আলোচনা করেন না, তাঁরা যথার্থ বৃদ্ধ নন; যার মধ্যে সত্য নেই, তা ধর্ম নয়; যার মধ্যে কপটতা আছে, তা সত্য নয়।'

তারপর গোবর্ধন আচার্য রাজাকে ভৎসনা করে উঠলেন, 'আপনি যে কেমন রাজা, তা বোঝা গেছে। আপনার রাজ্য অচিরেই নষ্ট হবে।' একথা বলে তিনি খনিত্র তুলে নিয়ে রাজমহিষীকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। তিনি রানীকে বললেন, 'আপনি রাজপত্নী বলেই অহংকারবশে এমন অধর্ম আচরণ করছেন? আপনার ভাই একে উৎপীড়ন করেছে, আর আপনি কিনা একেই পীড়ন করছেন? অচিরেই এই রাজ্যশ্রী ধ্বংস হবে। শুনেছি যে পালবংশের রাজারা বাহান্ন পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করবেন। পূর্বে রামপালের একমাত্র পুত্র

কোন স্ত্রীলোকের উপর উৎপীড়ন করেছিলেন। সেই ঘটনা জানার পর রামপাল পুত্রকে শূলে চড়িয়েছিলেন। লোকে আজও রামপালের যশের কথা বলে—রামপাল স্ত্রীদোষে অপরাধী পুত্রকে শূলে চড়ানোর দণ্ড দিয়েছিলেন। তাই যে মানুষের কীর্তি ও পুণ্যের কথা লোকমুখে গীত হয়, তিনিই পুরুষব্যাঘ্র এবং স্বর্গলোকে মহীয়ান।' এই কথা বলে গোবর্ধন আচার্য দণ্ডকমণ্ডুল নিয়ে সভা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। সভাসদ্‌গণ স্থাণুবৎ নিশ্চল হয়ে রইলেন।

তখন রাজা স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে আচার্য ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। আমিও সভাসদ্‌গণকে রূঢ় বাক্যে তিরস্কার করলাম। লজ্জিত রাজা নিজে খড়্গ ধারণ করে কুমারদত্তকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। আমি সত্বর রাজাকে প্রণাম জানিয়ে রাজশ্যালককে মার্জনা করলাম এবং বললাম, 'মহারাজ, আমি এঁর হাতে অপমানিতা হয়েছি, কিন্তু প্রাণনাশ বা জাতিচ্যুতি ঘটে নি। আমি আমার অভিযোগের যথোচিত ফল পেয়েছি, তাই এঁকে ক্ষমা করুন। আমারই দুর্ভাগ্য অথবা জন্মান্তরের পাপের ফলে এমন অপমান ঘটল। সকলে শান্তিতে থাকুন।' একথা শুনে উপস্থিত সবাই আমাকে সাধুবাদ দিলেন।"

পুনরায় সেই বণিকপত্নী মাধবী স্বামীকে আলিঙ্গন করে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর তিনি সকলকে বললেন, 'হে মহাসত্ত্ব, মহাপণ্ডিত সভাসদ্‌গণ, আপনারা সকলে শুনুন, যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় করে এই অভিযোগ করে থাকি, তাহলে স্বয়ং অগ্নি আমাকে ভক্ষণ করুন। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, দ্যুলোক, ভূলোক, জল, অন্তঃকরণ, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা এবং স্বয়ং ধর্ম মানুষের কর্ম জানতে পারেন। আমি শূদ্রার মতো ভালো কথা বলতে জানি না ; আমাকে বর দিন যেন স্বামীর সঙ্গে আমারও চিতা প্রস্তুত হয়। তাহলে আমি এখন বিদায় নিই।' একথা বলেই বণিকপত্নী মূর্ছিতা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

জ্ঞানচক্ষু সেক ব্রাহ্মণদের বললেন, 'আপনারা এর পরিচর্যা করুন।' তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে সেক তাকে বললেন, 'আপনি যা যা বলেছেন, তা সবই সত্য কথা। আপনি নিষ্পাপ। কিন্তু আপনি বর প্রার্থনা করলেন যে আপনারা স্বামী-স্ত্রী যেন একত্র পরলোকে যেতে পারেন। স্ত্রীহত্যার পাপভয়ে আমরা সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারি না। অন্য বর প্রার্থনা করুন।'

তখন বণিকপত্নী মনে মনে ভাবলেন, 'এই সেক আমাকে বর দিতে চান। এঁকে দেখে যেমন মনে হয়, বরদান করতেও ইনি তেমন শক্তিমান হবেন। শুনেছি বনের মধ্যে বাঘ মুখোমুখি এসেও এই সেককে ভক্ষণ করতে পারে নি। সুতরাং স্বামীর জীবন ছাড়া আর কী বর প্রার্থনা করতে পারি।' এই চিন্তা করে বণিকপত্নী মাধবী বললেন, 'হে ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি যদি আপনার সেবিকা হই, তবে আমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিন।'

সেক বললেন, 'ভদ্রে, এভাবে ঘুরিয়ে কথা বলছেন কেন? অন্য কোন বর প্রার্থনা করুন, যা আমরা দিতে সক্ষম হব। আপনার স্বামীর জন্য বৈদ্যের চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই বৈদ্যের কথা বলুন।'

সভাসদ্গণ সেককে জানালেন, 'এঁর স্বামীর শিরঃপীড়া আছে। অনেক ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয়নি, বরং প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।'

সেক মাধবীকে বললেন, 'আপনার স্বামী মধুকরকে আমার সম্মুখে হাজির করুন।'

বণিকপত্নী মাধবী স্বামীকে নিয়ে এলেন। সেক তাকে পরীক্ষা করলেন। তার জিভের ডগা একবার মুখের বাইরে পড়ছে, পুনরায় ভিতরে চলে যাচ্ছে; চোখদুটি মুদ্রিত, মাঝে মাঝে পাতা নড়ছে। সেক পুনরায় বণিকপত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাধবী, যদি তোমার স্বামী সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে তুমি কী করবে?'

মাধবী বললেন, 'যিনি এঁকে নিরাময় করতে পারবেন, আমি তাঁর দাসী হয়ে থাকব এবং স্বামীর যেসব ধনসম্পদ আছে, তিনি তার অর্ধেকের অংশীদার হবেন।'

সেক বললেন, 'এখানে উপস্থিত ছোট-বড় সকলেই প্রস্থান করুন। মাধবী, স্বামীর চুল উপরের দিকে খাড়া করে তুলে ধরুন। রাজা লক্ষ্মণসেনও এই ব্যাপারে অবহিত থাকুন। একটি লোহার ছুঁচ নিয়ে আসুন।'

তারপর সেক সেই ছুঁচটি আগুনে দিয়ে তপ্ত অগ্নিবর্ণ করে বণিকের মস্তকে যেখানে ব্যথা ছিল সেখানে বিদ্ধ করলেন। তখন বণিকের নাক দিয়ে নাকচিয়ারী নামে পরিচিত একটি পোকা বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বণিক মুখ হা করলেন। রাজা সেকের কথামত তার মুখে জল দিলেন। অতঃপর পাখা দিয়ে বাতাস করায় বণিক সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। সেকের নামে ধন্য ধন্য রব উঠল।

মাধবী সেকের পদবন্দনা করে বললেন, 'আমার স্বামীকে আর আমাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন।'

সেক—ধৈর্য ধরুন। আপনার স্বামী সুস্থ হলে বাড়ি ফিরে যান।

রাজা—মাধবী, সেককে অর্ধেক ধনসম্পদ দান করবেন না?

মাধবী—অর্ধেকের কথা থাক, সম্পূর্ণ ই সেকের। আমি বটের পাতাটুকুও গ্রহণ করব না, সেক সব গ্রহণ করুন।

সেক বুঝলেন মাধবী মনে মনে ভাবছেন সেক তার ধনসম্পদ গ্রহণ করতে রাজী হবেন। তাই তিনি বললেন, 'তোমাদের অনেক ধনসম্পদ আছে, তা থাক; এখন তুমি কুশলে ঘরে ফিরে যাও।

রাজা বললেন, 'এই বণিক তিন লক্ষ মুদ্রার মালিক।'

সেক রাজাকে বললেন, 'এ তো আপনারই মাহাত্ম্য যে আপনার রাজ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি তিন লক্ষ মুদ্রার অধিকারী।'

বণিকপত্নী মাধবী স্বামীকে ও সেককে প্রণাম করে নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে ফিরে চললেন। পথে লোকজন তাকে দেখতে এল এবং

কোলাহল করে বলতে লাগল, 'আপনার ঘটনা বলুন, আপনার ঘটনা বলুন।' তারা বলতে লাগল, 'যে রাজ্যে সেকের আগমনে মৃত ব্যক্তিও প্রাণ ফিরে পায়, সেই রাজ্য ধন্য, আর সেই দেশের রাজাও ধন্য।'

কিন্তু রাজা লক্ষ্মণসেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতিদের সঙ্গে সেকের চরণে প্রণাম জানালেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা পেলেন।

হলায়ুধমিশ্রবিরচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেকের আবির্ভাব কাহিনী সমাপ্ত।

চার

অমাত্যদের বিড়ম্বনা

তারপর একদিন মন্ত্রী উমাপতিধর সেকের উদ্দেশ্যে এক অভিচার-ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। কিন্তু লোকে তাঁর নিন্দা করতে লাগল। কুমারদত্ত লজ্জায় দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সকলে সেকের কথাই ভাবতে লাগল। প্রজারা তাঁকে রাজার মতো মান্য করতে লাগল। বণিকপত্নী মাধবী প্রতিদিন স্বামীর সঙ্গে এসে সেককে প্রণাম করেন।

একদিন সেক বললেন, 'মাধবী, কলিকালে লোকেরা অপবাদপ্রিয় হয়। তুমি আর এখানে আমার কাছে এসো না; তোমার স্বামী যদি স্বেচ্ছায় আসতে চান আসুন।'

সকলে সেককে খুব মান্য করছেন দেখে মন্ত্রী উমাপতিধর প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনও সেক ছাড়া আর কিছুই

জানেন না। সেক খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন রাজার চার অমাত্য একত্র হয়ে মন্ত্রী উমাপতিধরকে বললেন, 'মন্ত্রিবর, রাজা সর্বদা সেকের অনুরক্ত; অথচ আপনার প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ নেই। এ-ব্যাপারে কিছু পরামর্শ করা উচিত। একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি—আমরা অন্ধ সেজে সেকের সামনে হাজির হব, যদি বলতে পারেন অন্ধ নই, তাহলে বলব নিশ্চয় উনি মহাত্মা ব্যক্তি এবং তখন আর দুঃখের কারণ থাকবে না।' তারপর মন্ত্রী উমাপতিধরের অনুমতি নিয়ে চার অমাত্য অন্ধ সেজে সেকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর দ্বারে হাজির হয়ে বললেন, 'হে মহাত্মা সেক, আমাদের অন্ধত্ব দূর করে দিন। আপনার সেবকদের গ্রহণ করুন; আমরা আপনার দাসানুদাস।'

সেক এক ভৃত্যকে বললেন, 'ওরে, দরজায় কারা করুণ আবেদন করছে, ওদের ভিতরে নিয়ে আয়।'

তাঁর আদেশমতো লোকগুলিকে হাজির করানো হলে সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কে?'

তাঁরা বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী বরদাতা, আমরা চার অন্ধ। মহাত্মার অনুগ্রহে আমাদের অন্ধত্ব ঘুচে যাক। আপনি আমাদের আত্মীয়-পরিবার ও ধনসম্পদ সবকিছুর দায়িত্ব নিন।'

সেক—আপনাদের এই অন্ধত্ব কি জন্মগত, নাকি ইদানীং হয়েছে?

লোকেরা—হে মহাত্মা, ইদানীং হয়েছে।

সেক—কে কি কারণে অন্ধ হয়েছেন?

প্রথম জন—আমি একজন শুঁড়ি। মাথায় করে পাঁক বইতাম; তাই কাদায় চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় জন—আমি কুবেরী, আগুনের তাপে অন্ধ হয়েছি।

তৃতীয় জন—আমি বাত্তযন্ত্রী, সর্বদা বহ্নিসেবন করে অন্ধ হয়েছি।

চতুর্থ জন—আমি একজন দরিদ্র কলু, অনেকগুলি পোষ্য। দিনরাত্রি সরষে মাড়াই করতে হয়; অনিদ্রায় অন্ধ হয়ে গেছি।

তারপর সেক বললেন, 'আপনারা সত্য বলছেন তো? আপনারা যথার্থই অন্ধ, নাকি চক্ষুষ্মান্?' সেক বারবার তাঁদের সকলকে এই প্রশ্ন করলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা সকলেই সম্পূর্ণ অন্ধ।'

তারপর সেক বললেন, 'আগামী শুক্রবারে আবার আসুন। তারপর আপনাদের ভাগ্যে যা আছে—তাই হবে।' তিনি পুনরায় বললেন, 'যার যা স্বভাব, সে কখনো তা ত্যাগ করতে পারে না। শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা যায় না।'

তারপর চারজন অমাত্য সেকের ঘরের বাইরে এসে চোখ খুলে তাকালেন। কিন্তু চারজনের একজনও চোখে দেখতে পেলেন না। হায় হায়! আমরা মরলাম? একি হোল! একি হোল!—বলে তাঁরা সকলে কান্নাকাটি শুরু করলেন। তাঁদের স্ত্রীপুত্রেরা সেই সংবাদ শুনে সেই অবস্থায় তাঁদের গলা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল 'একি হোল! একি হোল।'

অনেক দুঃখে সাত দিন কাটল। শুক্রবার দিন পুনরায় তাঁরা চারজন সস্ত্রীক সেকের বাড়িতে পৌঁছোলেন। তাঁদের স্ত্রীরা সেককে বললেন, 'হে মালিক, আমাদের বর দিন।' একথা বলে কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে আছড়ে পড়লেন।

সেক—আপনাদের গলায় কলসী কেন?

অন্ধপত্নীরা—হে সর্বজ্ঞ, এতো আপনার জানা। তবু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলছি—আমাদের স্বামীরা প্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত। স্বামীদের চক্ষুষ্মান করে পুনরায় ফিরে পেতে চাই। যদি প্রভুর অনুগ্রহে এঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবেই আমরা বাঁচব, নতুবা গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরব; তাই আমাদের গলায় কলসী বাঁধা।

তখন সেক তাঁদের বললেন, 'বৈদ্যকে ডাকুন, ঔষধের ব্যবস্থা করুন।' তাঁরা সেককে বললেন, 'যদি আপনি আমাদের সেবিকা বলে মনে করেন, তাহলে এদের প্রত্যেকের হাতে একখণ্ড তৃণ দান করুন; তার দ্বারাই এঁরা সুস্থ হয়ে উঠুন। কারণ আপনি তো মৃতেরও প্রাণ ফিরিয়ে দেন।'

তখন সেক তাঁদের বললেন, 'আপনারা আমার কথামতো কাজ করুন।'

অন্ধপত্নীরা—তাই করব।

'এই শুঁড়ির নাম কি?'

'এর নাম শুক্লাম্বর।'

'এর গালে ও কপালে শুক্লচূর্ণ লাগিয়ে দিন।'

'কুবেরী পুরুষের নাম কি?'

'কালিকাবর।'

'এর গালে ও কপালে কালি মাখিয়ে দিন।'

'বাদ্যযন্ত্রীর নাম কি?'

'এর নাম দিগম্বর।'

'একে দিগম্বর করে দিন।'

'কলুর নাম কি?'

'এর নাম কেশব।'

'নাপিত ডেকে এর মস্তক মুণ্ডন করুন।'

'তারপর চারজনে মিলে গঙ্গায় গিয়ে বালি দিয়ে চোখ মার্জন করুন এবং সকলে গঙ্গার জলে ডুব দিন। অবশেষে ভাগ্যে যা ঘটে তাই ঘটুক। কিন্তু আমার কথা যদি অমান্য করেন তাহলে আমার কোন দোষ নেই।'

অন্ধেরা সকলে বললেন, 'গঙ্গায় গিয়ে মৃত্যু বরণ করাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। কি করে এর কথামতো আমরা এমন কদাকার সাজব!'

তখন তাদের স্ত্রীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বামীকে ভৎসনা করতে লাগলেন। ফলে সকলে সেকের কথামতো আচরণ করলেন। সমস্ত লোকজন খুব হাসাহাসি শুরু করল। তারপর একে একে গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে এসে সকলে সকলকে দেখতে সমর্থ হলেন। কিন্তু নিজেদের এমন বিকৃত রূপ দেখে তারা পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কোনমতে সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সকলে গৃহে ফিরলেন।

সাধারণে বলাবলি করতে লাগল, 'সেক এই লোকগুলিকে প্রথমে বিড়ম্বিত করে পরে অনুগ্রহ করলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, শত্রুও যদি অতিথি হন, তবু তাঁর প্রতি আতিথ্য দেখান উচিত। বৃক্ষ তার ছেদকের উপর থেকে নিজের ছায়া সরিয়ে নেয় না।'

তার পর থেকে সেই অমাত্য ও অন্যান্যরা প্রতিদিন সেককে সেবা করতে লাগলেন।

হলায়ুধমিশ্রবিরচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে চক্ষুপ্রদান কাহিনী সমাপ্ত।

পাঁচ

হাতির উপাখ্যান

সকল লোক সদা আনন্দিত হোন, সদা প্রিয়বাদী হোন।
সেকের দ্বারা অভিনন্দিত রাজা লক্ষ্মণসেন বিজয়ী হোন॥

একদা রাজা লক্ষ্মণসেন সেক ও অমাত্যদের সঙ্গে রাজকাজে মগ্ন রয়েছেন। সেই সময় এক হস্তিপালক রাজার কাছে হাজির হয়ে সাষ্টাঙ্গে নত হয়ে বললেন, 'হে মহারাজাধিরাজ শ্রীমান লক্ষ্মণসেন! আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করি—দুর্দান্ত নামে মহারাজের এক হাতি আছে; জন্মের পর থেকে তাকে অনেক শিক্ষা দিয়েও কিছুতেই আপনাকে নমস্কার করাতে পারলাম না। সেই হাতিটি জলপান করতে গঙ্গায় যাচ্ছিল; পথে যাবার সময় একটি উঁচু ঢিবি পড়ে। সেই ঢিবি মাড়াতে হল না, তবু হাতিটি সেখানে নমস্কার জানাল। প্রভুর পাদপদ্মে এই বিজ্ঞপ্তি নিবেদন করি। এখন আদেশ করুন কি কর্তব্য।'

রাজা সক্রোধে 'আরে দুরাচার।' এই বলে দ্বাররক্ষীকে আদেশ করলেন, 'একে বাইরে নিয়ে যাও, তারপর শিরশ্ছেদ কর।'

রাজার আদেশমতো দ্বাররক্ষী সেই হস্তিপালককে সঙ্গে করে কিছু দূরে যাওয়ার পর সেক রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি অন্যায় করলেন। এই দোষের জন্য ওকে বধ করা উচিত নয়। সে কয়েক দিন কয়েদখানায় আটক থাকতে পারে। লোকটি মূর্খ, তাই রাজসভায় এসে জানাল—মহারাজ, হাতি আপনাকে সেলাম জানাচ্ছে না।

রাজার আদেশে লোকটি ফিরে এল। রাজা বললেন, 'পণ্ডিতবর, এখন কি কর্তব্য ?'

সেক বললেন, 'ঘটনাটি সত্য অথবা মিথ্যা তা ওকে জিজ্ঞাসা করুন।' তারপর সেক ও আমাত্যের সঙ্গে রাজা সেই স্থানে গেলেন। তিনি দেখলেন অন্যান্য সব হাতি গঙ্গায় জলপান করতে যাবার সময় পথে সেই মাটির ঢিবির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে; কিন্তু দুর্দান্ত নামক প্রধান হাতিটি ঐ ঢিবিকে বন্দনা করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

রাজা—এখন কি কর্তব্য ?

সেক—এই ঢিবি খনন করুন।

ঢিবি কিয়ৎপরিমাণ খনন করার পর তার নীচে এক মণ্ডপ আবিষ্কৃত হল। তার অভ্যন্তরে এক যোগী বসে আছেন; যোগীর সামনে বাস্তুক গাছের একটি ডাল ও কিছু পঞ্চতণ্ডুল। রাজা-মন্ত্রী এই আবিষ্কার দেখতে কৌতূহলী হলে সেক তাদের নিষেধ করলেন।

সেক খননকারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগী কি জাগ্রত ?'

খননকারীগণ—যোগী জাগ্রত নন, নিদ্রিত।

সেক—অন্য যোগীদের এখানে আনয়ন করুন। তাঁরা শৃঙ্গনাদ করুন, তবেই এই যোগীর নিদ্রাভঙ্গ হবে।

রাজা লক্ষ্মণসেন অন্যান্য যোগীদের আনয়ন করলেন। তাঁরা শিঙা বাজালেন। তখন সেই যোগীর নিদ্রাভঙ্গ হল। কিন্তু তাঁর সম্মুখে আগত অন্যান্য যোগীদের মধ্যে একজন মাত্র সাহসী যোগী রইলেন, অন্যান্যরা পলায়ন করলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর যোগী সেই যোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?'

সাহসী মাথা নত করে বললেন, 'আমি প্রভুকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।'

যোগী—এই রাষ্ট্রের রাজা কে?

সাহসী যোগী—সমরবিজয়ী শ্রীমান লক্ষ্মণসেন এই রাষ্ট্রের রাজা।

যোগী—রাজা বিক্রমকেশরী কোথায়?

সাহসী যোগী—প্রাচীন রাজা বিক্রমকেশরীর নামমাত্র আমরা শুনেছি, তাঁকে চোখে দেখি নি। বর্তমান রাজা এখানেই আছেন।

যোগী—তাঁকে আন।

সাহসী যোগী—সেই রাজা এখন এক যোগীর সঙ্গে রয়েছেন।

একথা শুনে যোগী স্বয়ং রাজার কাছে গেলেন।

সেক যোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম আপনার?'

যোগী উত্তর দিলেন, 'আমার নাম চন্দ্রনাথ।'

সেক রাজাকে বললেন, 'এই যোগীর জন্য অন্নপানাদির ব্যবস্থা করুন।'

যোগী বললেন, 'যদি অমৃতান্ন পাই, তবেই খাব।'

লক্ষ্মণসেন ভাবলেন এই যোগী মিষ্টান্নভোজী। তিনি তাঁকে মিষ্টান্ন দিলেন এবং বললেন, 'এখানে কোন পণ্ডিত আছেন কি?'

তারপর রাজা গোবর্ধন আচার্যকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এই যোগী মিষ্টান্নকে বিষান্ন বলছেন কেন? তিনি একজন পণ্ডিতকে চাইছেন। আপনি পণ্ডিত। এই খাদ্য অমৃতান্ন এ-কথা তাঁকে বলুন।

ব্রাহ্মণ গোবর্ধন আচার্য বললেন, 'এই যোগীকে কুৎসিত অন্ন ও কালো কচুশাক দিন।'

যোগী সেই কদন্ন ও শাক অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগী, মিষ্টান্ন ত্যাগ করে কদন্ন খেলেন কেন?'

যোগী রাজাকে বললেন, 'মিষ্টান্ন খেলে তা আমার পক্ষে বিষ হয়; কিন্তু কদন্ন খেলে পরিণামে তা অমৃত হয়।'

এভাবে মিষ্ট আলাপে রাজা সেই দিনটি কাটালেন। রাজার আদিষ্ট সেবকদের সঙ্গে যোগী সেই স্থানেই রইলেন। রাজা সেকের সঙ্গে আপন ভবনে ফিরলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজা সেবকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগী রাত্রিতে কি করলেন?'

রাজকর্মচারীরা বললেন, 'যোগী রাত্রে কিছুই করলেন না। কিন্তু তাঁর আবাসে কোন আলো না থাকলেও সমস্ত আবাস যেন আলোক-মালায় সাজান ছিল।'

বাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'ওহে মন্ত্রী, এ কেমন ব্যাপার!'

মন্ত্রী বললেন, 'আজ রাত্রিতে আমি থাকব; পরদিন সকালে আপনাকে আসল ঘটনা জানাব।'

মন্ত্রী যোগীর সঙ্গে রাত্রি কাটিয়ে বুঝলেন তাঁর বস্ত্রে মণি আছে। তিনি সকালে রাজাকে সেই কথাই বললেন, 'এই যোগীর পরনেব কাপড়ে কোথাও একটি রত্ন আছে; এ আলো তারই প্রভাব।'

বাজা বললেন, 'এই রত্ন কি উপায়ে অধিকার করা যায়?'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আপনি যোগীর কাছে গিয়ে কথাচ্ছলে তাঁকে খুশী করে সেই রত্নটি দেখাতে অনুরোধ করবেন। তারপর রত্নটি দেখে খুব প্রশংসা করবেন। তবেই যোগী আপনাকে রত্নটি দান করবেন।'

মন্ত্রীর কথামতো রাজা বারবার যোগীর কাছে যাতায়াত করলেন; কিন্তু সেই রত্ন প্রার্থনা করতে পারলেন না।

একদিন যোগী বললেন, 'মহারাজ, আমি ভিক্ষুকমাত্র, আপনি রাজা। সর্বদা আমার কাছে আসেন কেন? যদি কোন কাজের উদ্দেশ্যে আসেন, তাহলে বলুন।'

রাজা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মহাযোগী, ভয়ে সেকথা জানাতে পারি নি।'

যোগী—মহারাজ, ভয় কিসের? কোন ভয় নেই। স্বেচ্ছায় বলুন।

রাজা—আপনার রত্নটি দেখতে চাই।

তখন যোগী বস্ত্রের ভিতরে লুকানো রত্নটি গ্রহণ করে রাজার হাতে দিলেন, রাজা সেই রত্নের অনেক প্রশংসা করে মাথায় রাখলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই রত্ন যোগীকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে যোগী বললেন, 'মহারাজ, এ রত্ন আপনি গ্রহণ করুন। যতদিন গুপ্ত ছিল ততদিন আমি তা ধারণ করেছিলাম, এখন আপনি গ্রহণ করুন; বর্তমানে সকলেই এর সংবাদ জানেন। কলিকালে ধনলোভে যে-কেউ এই রত্ন চুরি করতে পারে; আপনি সযত্নে এটি রক্ষা করুন। এর মূল্য আপনার রাজ্য অপেক্ষাও বেশী।'

রাজা লক্ষ্মণসেন যোগীর রত্ন লাভ করে হাসিমুখে ঘরে ফিরলেন। তিনি সেই রত্নটি বিছানার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তার পর থেকেই রাজার বাসভবনে রাত্রি অনুভূত হত না। অনন্তর একদিন সেক, যোগী ও রাজা লক্ষ্মণসেন একত্র বসে আছেন। রাজা সেককে প্রণাম করে বললেন, 'মহাজ্ঞানী, আপনাকে দু-চারটি কথা বলতে চাই; কিন্তু ভয়ে বলতে পারি না।'

সেক বললেন, 'আমি বর্তমান থাকতে ভয় কিসের? নির্ভয়ে এবং স্বেচ্ছায় বলুন।'

রাজা সেককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন্ রাজ্য থেকে আসছেন? কোথায় বা আপনার দেশ? আপনি কার পুত্র? এসব কথাই শুনতে চাই।'

সেক বললেন, 'আপনি প্রথমে যোগীকে এসব প্রশ্ন করুন।'

রাজার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে যোগী বললেন, 'প্রথমে সেক বলুন, তারপর আমি বলব।'

সেক রাজাকে বললেন, 'আচ্ছা, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমিই প্রথম বলবো।'

রাজা বললেন, 'কোন লোক কি স্বেচ্ছায় মৃত্যু কামনা করে? কেই বা বাঘ অথবা সাপের সঙ্গে খেলা করতে চায়? কে এমন আছে যে আপনার কথায় অবিশ্বাস করবে?'

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থে চন্দ্রনাথ যোগীর দর্শন নামক কাহিনী সমাপ্ত।

ছয়

সেকের চরিত

সেকের মঙ্গল আখ্যান যিনি শোনেন অথবা শোনান,
তার সর্ব বিঘ্ন নাশ হয় আর মঙ্গল বর্ধন হয়।

সেক বললেন, "মহারাজ শুনুন, আমি পশ্চিম দেশ থেকে আসছি। অট্রাব রাজ্যে আমার জন্ম। বাবার নাম কাফুর। যখন পূর্ণ পাঁচ বছর বয়স, তখন বাবা আমাকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। দৈববশত আমার গুরু মহাশয় একবার যা বলতেন, আমি সেই বিষয় গ্রহণ করতে পারতাম; দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হত না। আমার দেশের লোকেরা বলত—'তুমি ধন্য; একবার মাত্র শুনেই সে বিষয় মুখস্থ করতে পারো।'

আমি যখন বিদ্যাভ্যাস করছি তখন সেখানে রমজান নামে এক শেঠ বাস করতেন। রাজার মতই তাঁর ধনসম্পদ। লোকজন সেই শেঠকে বললেন, 'ওহে সওদাগর, কাফুরের এই পুত্রটি অতি বুদ্ধিমান; গুরুর মুখে একবার শুনলে আর জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না।'

শেঠ রমজান একথা শুনে ভাবলেন, 'আমারও একটি বেটি আছে। যদি আল্লার কৃপা হয়, তাহলে সব কিছুই ঘটবে।'

শেঠ রমজান গরিব কাফুর ও তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের আদেশ দিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। তারপর আমি দেখলাম সেই শেঠের বাড়ি থেকে আমার পিতার কাছে কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র আসতে লাগল। তখন আমি বাবা ও মাকে বললাম, 'বাবা-মা, আমরা পরের অন্ন কেন খাব ?'

তাঁরা বললেন, 'বাপজান, আমরা গরিব ; পরান্ন মুখে তোলা ঠিক নয়, কিন্তু কি করি ?' আমি বললাম, 'তোমরা এখানে থাক ; আমি শাকের সন্ধানে অরণ্যে যাচ্ছি।' বাবা-মা বললেন, 'বাপজান, তুই যথেচ্ছ চলে গেলে আমরা মরে যাব।' সেকথা শুনে আমি তাঁদের সবকিছু ক্ষমা করলাম। তারপর শেঠ রমজান দেশে ফিরলেন। তখন আমার বয়স বার। একদিন তিনি আমাকে খাওয়ানোর অছিলায় তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং খিড়কির পুকুরে পাঠালেন। তারপর আয়াসী নামে সেই শেঠকন্যা সেখানে স্নান করতে এল। স্নান সেরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আপনি ?'

আমি বললাম, 'মেয়ে, তুমি কি চোখে দেখ না। আমরা এক গ্রামে বাস করি, অথচ জিজ্ঞাসা করছ আমি কে! তুমি আমাকে চেন না ?'

শেঠকন্যা আয়াসী হাসতে হাসতে বলল, 'ওহে পণ্ডিত, আমি অন্ধ নই। আমার সব অঙ্গই ঠিক আছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি কি পুরুষ, নাকি নপুংসক! আমার কথার জবাব দাও।'

আমি বললাম, 'মেয়ে, আমি স্ত্রী ও পুরুষ দুই। আমি নিজে স্ত্রী, আবার নিজেই পুরুষ।'

আয়াসী হাসিমুখে বলল, 'সে কেমন কথা ?'

আমি—কেন নয় ?……বিরোধী গুণ আছে তাই।

আয়াসী—স্ত্রী সন্তান প্রসব করে। তুমি কি তাই কর ?

আমি—মূর্খ, আমি প্রসব করি না তো কি তুমি কর? তুমি তো শুধু প্রসবের আধার, যেমন কোন পাত্রে কোন দ্রব্য জমা থাকলে তার আসল মালিক জমাকর্তা দেবদত্ত।'

এভাবে আমাদের বিবাদ শুরু হল। আমি তাকে বললাম, 'এই প্রশ্ন কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করব। যদি তুমি হার, তাহলে নাক-কান কাটা যাবে।'

আয়াসী বলল, 'যদি তুমি হার তাহলে বল, তোমার মার্গ শোধন করা হবে।' আমাদের দুজনার এরূপ পণ ঠিক হল।

আয়াসী বলল, 'তোমার মতো অনাথের শাস্তি হোক তা চাই না।'

আমি বললাম, 'আমার মত অবস্থাপন্ন আর কে আছে?'

এই কথাবার্তার সময়ে এক চক্রবাক দম্পতি সেই পুকুরের জলের ধারে এসে বসল। আয়াসী আমাকে তাই দেখিয়ে বলল, 'চক্রবাক দম্পতিকে দেখ। চক্রবাকী এখন সনাথা। সে উড়ে চলে গেলে চক্রবাক অনাথ হয়ে পড়বে।' এ কথা বলে সে একটি চাঁপার কুঁড়ি আমার হাতে দিতে চাইল। আমি বললাম, 'এটি উচ্ছিষ্ট।' তারপর একটি কালিকা ফুল এনে সে আমাকে দিতে চাইল। আমি বললাম, 'এ ফুলের গন্ধ নেই।'

সে আমাকে তার প্রতি আসক্তিশূন্য দেখে ঘরে মায়ের কাছে ফিরে গেল। তার মা বললেন, 'বেহায়া, তুই তার সঙ্গে মনোমালিন্য করে চলে এলি? লোকে বলবে এই হতচ্ছাড়া মেয়ে অন্য কাউকে পেয়ার করে।'

তখন সে তার মাকে বলল, 'অন্ধ ভস্মমুখী মা! তার সংসার ত্যাগের ইচ্ছা দেখেই এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি ঠিক বুঝেছি, ও পুরুষের সংসারে মন নেই; শুনেছি উনি নাকি যোগী। তেমন লোকের সঙ্গে মেয়ের সাদি ঘটাবে? তোমরা কি চাও আমার যৌবন আর অন্য সব সুখ বিফল হোক?'

এমন কথা শুনে তার মা খুবই দুঃখ পেলেন। তারপর আমি স্নান সেরে ফিরলে তিনি নানা ব্যঞ্জনসমেত অন্ন আমার সামনে হাজির

করলেন। আমি সেই অন্ন ছেড়ে দিয়ে বলে-কয়ে শাক-ভাত আনিয়ে খেলাম। শেঠ রমজান ভাবলেন যে আমি তো গরিব, তাই এমন উৎকৃষ্ট খাদ্যের স্বাদ বুঝি না; না হয় নাই জানল, পরে পরে ঠিক জানবে।

তারপর রাত্রিতে আমি একা ঘরে শুয়ে পড়েছি। তখন শেঠের বেটি আয়াসী বাটিতে তেল নিয়ে আমার কাছে হাজির হল। তারপর সে আমার দুই পায়ে তেল মালিশ করতে লাগল।

আমি বললাম, 'তোমার যা খুশী তাই কর।'

তেল মালিশ শেষ করে সে বলল, 'প্রভু রাত্রিতে একা শুতে ভয় পাই, তাই আপনার কাছে শুতে চাই।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা ঘুমোও তাতে কি হয়েছে?'

তখন আয়াসী বলল, 'হে মহাত্মা, আলোতে আমার ঘুম আসছে না; আলো নিবিয়ে দিন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা নিবিয়ে দাও।'

তারপর ঘুমের ছল করে সে আমার কোলের মধ্যে এল এবং আমার দুই হাত ধরে তার বুকে ও স্তনের উপর রাখল; তারপর রতিগৃহে আমার লিঙ্গ স্থাপন করল। আমি তার উপর মায়ের ভাব দেখিয়ে দুই হাতে তার স্তন ধরে মুখে পুরে নিলাম এবং দাঁত দিয়ে কামড় দিলাম। তৎক্ষণাৎ সে 'ওমা কি হল' বলতে বলতে আমার কাছ থেকে সরে গেল। সে বলে গেল যে বিবাহযোগ্যা নারী কোন পুরুষকে ভজনা করলে যদি সেই পুরুষ তাকে আনন্দ না দেয় তাহলে তার অধোগতি হয়। এভাবে নানান উপায়ে সে বুঝল যে আমি একটি নপুংসক।

তখন অমি তাকে শুনিয়ে বললাম 'ওগো অবলা, গর্ভবাসের দুঃখ সহ্য করতে চাই না বলেই পুনর্জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা নেই। জীব দুভাবে উৎপন্ন হয়—যোনিজ আর অযোনিজ। এই দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীগর্ভে জন্ম লাভ করা অতিশয় দুঃখজনক। মাতৃগর্ভে জন্ম হলে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম হবে এবং তারপর আবার মৃত্যু ঘটবে। তাই আমি এমন কাজ করব

যার ফলে পুনর্জন্ম হবে না। আমি দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ভ্রমণ করব ; কারণ প্রকৃত বিচারের অভাবেই রূপময় ভাগাকে রমণীয় বলে মনে হয় ; কিন্তু যারা যথার্থ জ্ঞানী তাদের কাছে সংসারের কোন বস্তুই রমণীয় বলে মনে হয় না'

এভাবে আমি সেই শেঠকন্যা আয়াসীকে নিষেধ করলে সে ঘরে ফিরে গেল এবং শেঠও আমাকে তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর সাধারণে বলতে লাগল যে শেঠ রমজান মহা সমারোহে বেটির সাদি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বোঝা গেল না তার জামাই ভাবী স্ত্রীকে ছেড়ে নিজের বাড়িতে পালিয়ে এল কেন !

লোকমুখে একথা শুনে শেঠ রমজান আমার বাবার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলে আমার বাড়িতে যা খানা খেয়েছে তার দাম ফেরত পাঠাও।'

একথা শুনে আমার বাবা-মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তখন আমি ভাই গরিবের সঙ্গে মৌলবীর কাছে পড়াশুনা করছি ; কথাটা আমাদের কানে গেল। আমি মৌলবীকে বললাম, 'মৌলবীসাহেব, আমি যতদিন না আমার বাবা-মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনি ততদিন আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।' একথা বলে আমি ভাইকে সঙ্গে করে গ্রামে তাঁদের সন্ধান করলাম ; তিন দিন পর ঘরে ফিরে শিক্ষা-দাতার কাছে হাজির হলাম এবং দেখলাম তিনি সেই অবস্থায় বসে আছেন।

মৌলবী আমাকে বললেন, 'ওহে মহাবুদ্ধি, তুই ভাইয়ে মিলে এ কেমন বশীকরণ করেছ। আমি এখান থেকে উঠতে চাইছি অথচ উঠতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমায় যেতে দাও।'

তার কথা শুনে আমার মনে একটু ভয় হল। আমি শিক্ষাদাতাকে বললাম, 'আপিনি স্বেচ্ছায় চলে যান।'

একথা বলামাত্রই মৌলবীসাহেব প্রস্থান করলেন। তারপর ঘরে পৌঁছে তিনি আর বাইরে আসতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে ভয় পাই ; তোমাকে পড়াতে পারব না।'

ফলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হল। সকলে আমার সম্বন্ধে বলতে লাগল, 'এ লোক যা বলে তাই ঘটে।' কেউ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না। আমি নিজে কথাবার্তা বলতে গেলে সবাই ছল করে এড়িয়ে গিয়ে ঘরে চলে যায় এবং অন্যকে কথাবার্তা বলতে দেয় না।

সেকের চরিত্রে রত্নশেখর পর্বতের উপাখ্যান

সবকিছু জেনেশুনে আমি ছোট ভাই গরিবকে বললাম, 'ভাইজান, রত্নদ্বীপের কাছে রত্নশেখর নামে এক পাহাড় আছে; সেই পাহাড়ে সৌগন্ধিক নামে গাছ আছে। সেই গাছের তলায় যারা বাস করে, তাদের ক্ষুৎপিপাসা কিংবা জরা থাকে না। আমি সেখানেই যাব, তুমি এখানে থাক।'

আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলে গরিব দুঃখের সঙ্গে বলল, 'ভাইজান শোন, ওদেশে খুব ভয়; বনে ঘেরা দুর্গম জায়গা। সেখানে গেলে তুমি বাঁচবে না। যদি আমাকে ভাই বলে মনে কর, তাহলে যাত্রা বন্ধ কর, আমাকে বাঁচাও।'

আমি ভাইকে বললাম, 'কে কোন্ জীবকে মারতে পারে? কেই বা রক্ষা করতে পারে? জীব অসৎ কাজ করে নিজেকে মারে আর সৎকাজ করে নিজেকে বাঁচায়।'

ভাইকে আশ্বাস দিলেও সে একা থাকল না, আমার সঙ্গেই গেল। তারপর মহা দুঃখে সেই পর্বতে হাজির হলাম। গিয়ে দেখলাম সেই সৌগন্ধিক গাছের কোন ডালে ফুল, কোন ডালে ফল, তার মধ্যে কতকগুলি পাকা। কিন্তু দুজনার কেউই গাছে চড়তে পারলাম না, কারণ সব ডালের চতুর্দিক বেতের ঝোপে ভরা। পাহাড়ে বাঘ প্রভৃতি নানান জন্তু রয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে হিংসা করছে না। আমরা কতকগুলি ফল খেলাম এবং খুশীতে রইলাম। একদিন সেখানে এক ময়ূর হাজির হল। তারপর এক বকদম্পতি এল। ময়ূর সেখানে বুনো ধান খেয়ে মনের আনন্দে কাটাতে লাগল। বক খিদের

আলায় তার পত্নীকে বলল, 'প্রিয়ে, এই ময়ূর মহাপাপী ! এর পায়ের শব্দে পতঙ্গরা এখান থেকে অন্যত্র পালিয়েছে। আমি খুব ক্ষুধার্ত, এই স্থান ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া ভাল।'

তার কথা শুনে ময়ূর সক্রোধে বলল, 'ওরে পাপিষ্ঠ, তোর জন্মান্তরের পাপের ফলেই প্রাণীদের ভক্ষণ করিস ; আর কিনা রূঢ় ভাষায় আমাকে কষ্ট দিলি !'

এভাবে উভয়ের বিবাদ শুরু হল। বলবান ময়ূর দুর্বল বককে পা দিয়ে তাড়া করল। তারপর দুজনেই পাখিদের রাজার কাছে গেল। প্রথমে বক বলল, 'পক্ষিরাজ, সৌগন্ধিক গাছের তলায় দুজন মানুষ এসে হাজির হয়েছে। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমাদের রাজা ?' আমি বলেছি, 'মহাসত্ত্ব নামে এক বদান্য ধার্মিক পাখি আমাদের রাজা।' একথা বলা মাত্রই ময়ূর আমাকে পা দিয়ে তাড়া করল এবং আপনার নিন্দা করতে লাগল। আমি আপনার নিন্দা সহ্য করতে না পেরে একথা আপনাকে নিবেদন করলাম।'

পক্ষিরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে ময়ূর, তুমি বককে তাড়া করেছ কেন ? কেনই বা আমাকে অসম্মান করেছ ?'

ময়ূর বলল, 'প্রভু, এ বক মিথ্যাবাদী। আপনি সেই মানুষ দুজনকে জিজ্ঞাসা করুন, তারপর আমাকে শাস্তি দেবেন।'

তখন পক্ষিরাজ তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য সেই গাছতলায় এক কাককে পাঠালেন। কাক এসে বলল, 'ওহে বিদেশী মানুষরা, আমি পাক্ষিরাজের দূত। তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ময়ূর ও বকের ঝগড়ার ব্যাপার আপনারা জানেন কি ? যদি শুনে থাকেন বলুন কে অপরাধী।'

তখন আমি কাককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি ?'

কাক বলল, 'আমার নাম মেঘবর্ণ'

আমি বললাম, 'তুমি অখাদ্য ভক্ষণ কর : তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। তোমাদের রাজাও মূর্খ, কারণ যে বিবাদের সময় অনুপস্থিত,

তাকে সাক্ষী করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। যদি এই সাক্ষীর সামনে দুজনে ঝগড়ার কথা বলত, তাহলে সাক্ষী বলতে পারত কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী।'

আমার মুখে একথা শুনে কাক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাজাকে সব কথা জানিয়ে বলল, 'পক্ষিরাজ, সেই দুজন মানুষ সাক্ষ্য দিল না; আমাকে ভৎসনা করল এবং আপনাকেও অধার্মিক বলল, কারণ আপনি পরোক্ষ সাক্ষী চেয়েছেন।'

তখন পক্ষিরাজ সক্রোধে বললেন, 'সব পাখি সেই গাছতলায় চলো যেখানে ঐ দুজন মানুষ রয়েছে। সেখানে পৌঁছে গাছের ডালে বসে তোমরা আরাম করো।'

পক্ষিরাজের আদেশে সব পাখি সেখানে পৌঁছাল এবং যথা নির্দিষ্ট আচরণ করল। আমি তাদের সেই অবস্থায় দেখে বললাম, 'ওহে পাখিরা, তোমরা এই গাছে বসেই আরাম করো।' একথা বলে আমরা দুজনে অন্যত্র গমন করলাম। আমার কথামতো পাখিরা সেখানেই বসে রইল, উড়ে যাবার শক্তিও হারাল। তার পরের দিন দুই শৃগাল আমাদের সামনে উপস্থিত হল। তারা বলল, 'আপনাদের কুশল তো? আমাদের ভাগ্য ভাল যে আপনারা দুই ভাই এই বনে ভ্রমণ করছেন। তার কারণ সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অমৃততুল্য দুটি ফল, এক—সাহিত্যরূপ অমৃতের আস্বাদ, দুই—সজ্জনসঙ্গ। আপনাদের আগমন সংবাদ পেয়ে আমাদের খুব উৎসাহ হল।'

আমি শৃগাল দুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের নাম কি?'

উভয়ে বলল, 'আমাদের নাম দমনক ও করটক।'

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই পর্বতে কি কি ভাল এবং কি কি মন্দ বস্তু আছে?'

তারা বলল, 'হে মহাত্মা, এখানে সবই ভাল; মন্দ কিছুই নেই। এখানে যে সব জন্তু আছে তারা একে অন্যকে হিংসা করে

না। আপনি যেখানে খুশী সুমিষ্ট ফল খান। এই বনে ক্ষুৎপিপাসার অস্তিত্ব নেই।'

এমন সময় দেখা গেল এক উঁচু পাথরের উপর এক শিঙওয়ালা হরিণ ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত হরিণকে দেখে দুই শৃগাল তাকে খাওয়ার লোভে তার উপর লাফ দিয়ে পড়ল। হরিণ তা দেখে বলে উঠল, 'ওরে অধম শেয়ালরা, আমার বিষ্ঠা ভক্ষণ কর্। আমি কি মানুষ যে মিথ্যা কথায় প্রতারণা করবি?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওহে মৃগ, তুমি শেয়ালদুটিকে অধম বলে ভং সনা করছ কেন?'

হরিণ বলল, 'শুনুন, শৃগাল আর কাক সর্বদা পাপ আচরণ করে। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা কখনো তাদের সঙ্গে আলাপ করেন না। শুনেছি কোন গ্রামে এক গৃহস্থ ছিল; তার গৃহচত্বরে এই শৃগাল দুটি বাস করত। একদিন সেই গৃহস্থের স্ত্রী তার একমাত্র ছেলেকে বাড়ির মেঝেতে শুইয়ে রেখে পুকুরে জল আনতে গেল। এই সুযোগে দুই শৃগাল তার ছেলেকে খেয়ে ফেলল এবং তার হাড়গুলি তার বাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে রাখল। গৃহকর্ত্রী ফিরে এসে ছেলেকে খুঁজতে লাগল। কোন সন্ধান না পেয়ে সে রাজার কাছে নালিশ জানাল, 'মহারাজ আমার গৃহপ্রাঙ্গণে বসবাসকারী দুই শৃগালের অনুসন্ধান করুন।' তারপর রাজার লোকজন তার গৃহপ্রাঙ্গণেই এক শৃগালকে জিভ দিয়ে রক্ত চাটতে দেখল; হাড়গুলিও খুঁজে পাওয়া গেল। দুই শৃগাল রাজাকে বলল, 'প্রভু, এই স্ত্রীলোকটি ডাকিনী, নিজের ছেলেকে খেয়ে আমাদের দোষ দিচ্ছে।' তখন রাজা সত্য ঘটনা না জেনেই ঐ স্ত্রীলোকটির কর্ণ-নাসিকা ছেদন করলেন এবং তাদের ধনসম্পত্তি হরণ করলেন। সেই দোষেই ঐ দুই শৃগাল এখানে হাজির হয়েছে।

তারপর ক্রোধে নির্বাক ও রক্তচক্ষু আমাকে দেখে দুই শৃগাল পালিয়ে গেল।"

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সাত

এই পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে সেক মৌনী হয়ে রইলেন। তাঁকে নির্বাক দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না।

তারপর রাজা লক্ষ্মণসেন সেককে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'হে মহাত্মা, আমি আরও শুনতে চাই।'

সেক পুনরায় বলতে শুরু করলেন—"সেই ঘটনার তিনদিন পর সর্বজ্ঞ নামে এক শুক পাখি পক্ষিরাজকে বলল, 'ওহে পক্ষিরাজ, পক্ষি-শাবকেরা ভয়ানক কোলাহল করছে; এদের মা-বাবারা কোথায় গেল?'

পক্ষিরাজ উত্তর দিলেন, 'ওহে মন্ত্রী শুক, আমি নিজেই কুকর্ম করেছি। ময়ূর ও বকের বিরোধে সকলকে পাঠিয়েছি।' এই বলে পক্ষিরাজ মন্ত্রী শুককে সব ঘটনার বিবরণ দিলেন।

ঠিক এই সময় বনের মধ্যে দুই বাঘ আমাদের কাছাকাছি এসে হাজির হল। দূর থেকেই তারা আমাদের বলল, 'ওহে দুই বিদেশী, আমাদের খুশী কর। তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে আমাদের খাদ্যরূপে সমর্পণ কর।'

তখন আমি সক্রোধে বললাম, 'ওরে প্রাণিঘাতক দুই পাপিষ্ঠ, সংসারে এমন কে আছে যে নিজের মৃত্যু চায়। নিজেদের শক্তিতে যা সম্ভব তাই কর।'

বাঘ দুটি আমাদের দুই ভাইকে বলল, 'ওহে বৈদেশিকগণ, এই বনে ঢুকলে আর কেউ ফিরে যেতে পারে না; শৃগাল ইত্যাদি জন্তুরা তাদের ভক্ষণ করে।' এই বলে বাঘ দুটি পলায়ন করল।

আমি ভাই গরিবকে বললাম, 'ভাইজান, ভয় পেয়ো না, সাহস রাখ।

সে বলল, 'ভাইজান দুর্দৈববশে আমরা দুই অনাথ মাতা-পিতাহীন ভাই এখানে এসে পড়েছি ; এখন বাঘের মুখে প্রাণ যায়। কিন্তু আমাকে দিলে যদি তুমি রক্ষা পাও তাহলে অন্যবার যখন বাঘ আসবে তখন আমাকে দান করবে, কারণ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আর আমি যদি বাঘের মুখে মারা যাই তাহলে অন্তত তুমি বাঁচবে এবং মা-বাবার ঋণ শোধ করবে।'

তখন আমি রাগের চোটে তার কানে এক চড় বসিয়ে বললাম, 'মূর্খ! আমি আবার কার কাছে ঋণী! পাখি গাছে বিশ্রাম করে গাছ থেকে উড়ে যাওয়ার পর সেই গাছের কাছে ঋণী থাকে কি?'

ক্ষণকাল বিশ্রাম করে সে আমাকে বলল, 'ভাইজান আসল ব্যাপার তুমি জান না। দেখ কুমোর মাটি সংগ্রহ করে ঘট বানায়, তারপর স্বেচ্ছায় বিক্রী করে ; তেমনি আমরাও পিতামাতার শুক্র ও শোণিত থেকে জন্মেছি। তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য এখনও কিছুই করতে পারিনি।'

ভাইয়ের কথা চিন্তা করে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম—'ধিক্ আমাকে! অকারণে ভাইজানকে এমন তাড়না করলাম।'

তার পরের দিন পক্ষিরাজ তার মন্ত্রী শুককে আমার কাছে পাঠালেন। শুক এসে মাটিতে নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে বলল, 'আপনি জানেন আমি পক্ষিরাজের মন্ত্রী। আমি আপনাদের দুইজনকে প্রণাম জানিয়ে কিছু বলতে চাই।'

আমি বললাম, 'মন্ত্রী শুক, স্বেচ্ছায় বল।'

তখন মন্ত্রী বলল, 'এই পাখিদের শাবকগুলির অনেকে মৃত, আবার অনেকের প্রাণসংশয়। এই পাখিরা কেন এই সৌগন্ধিক গাছের ডাল ছেড়ে উড়ে যেতে পারছে না, তার কারণ জানতে পক্ষিরাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

আমি সহাস্যে বললাম, 'ওহে মন্ত্রী শোন, এই পাখিরা সবাই আমাদের উপরে ডালে বসে মজা শুরু করেছিল। আমি বললাম—

ওহে পাখিরা, তোমরা মজাই করো, কিন্তু আর উড়তে পারবে না। তাই এদের এমন অবস্থা।'

তখন মন্ত্রী বলল, 'হে দয়াশীল, আপনি এদের অনুগ্রহ করুন। পাখিদের অন্যায় আপনার গ্রহণ করা উচিত নয়। তাইতো বলা হয় যে সজ্জনেরা নির্গুণ প্রাণীকেও দয়া করেন, যেমন চন্দ্র চণ্ডালের বাড়ি থেকেও আপন জ্যোৎস্না দূরে সরিয়ে রাখে না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমাদের রাজাটি বড় মূর্খ, অথচ তুমি বেশ পণ্ডিত। বল দেখি কোন্ নিয়মে তুমি তার মন্ত্রী হলে।'

তখন মন্ত্রী শুক বলতে লাগল—কোন এক সময় রত্নশেখর দ্বীপে এক গুরু-আহারী বিহগ বাস করত। তাকে দেখে ঐ কাক মনে মনে ভাবল, 'অত্যধিক ভক্ষণের জন্য এই বিহগ মারা যাবে। আমি তখন এর মাংসে উদর পূর্ণ করব।' এরূপ চিন্তা করতে করতে কাক সেই বিহগের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাল; কিন্তু বিহগ মরল না।

তারপর দুষ্ট কাক জিজ্ঞাসা করল, 'হে পক্ষিরাজ, আপনি এমন বিমনা রয়েছেন কেন?'

বিহগ উত্তর দিল, 'আমি অজীর্ণ রোগে ভুগছি, চলার শক্তি হারিয়েছি।'

কাক বলল, 'হায়! হায়! আচ্ছা যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় বলুন।'

বিহগ বলল, 'তুমি শুধু উপকারের কথাই বলছ; তাহলে আমি আর কি করি!'

কাক বলল, 'প্রভু শুনুন, পিঠ দিয়ে রোদ পোহান উচিত, জঠর দিয়ে অগ্নি সেবন করা উচিত এবং সর্বতোভাবে প্রভুর সেবা করা উচিত। আমি যদিও আপনাকে ভয় পেতাম, তবু আপনার কল্যাণ কামনাই করতাম; এখন আজ্ঞা করুন কি করতে হবে।'

বিহগ বলল, 'রত্নাকর সমুদ্রের মাঝখানে এক জীর্ণ গাছ আছে। ঠোঁট দিয়ে সেই গাছের ছাল এনে আমায় দাও। যদি এই কাজ করতে পার, তাহলে বুঝব তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই।'

তারপর কাক সমুদ্রে গিয়ে সেই ওষুধ সংগ্রহ করে ফিরে এল। বিহগ সেই ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। তখন কাক বিদায় নিতে চাইলে পক্ষিরাজ বলল, 'ওহো, তুমি আমার উপকার করেছ; তাহলে এখানে থাক। আমি নিজের দেশে ফিরব। কাক তাকে প্রণাম করে বলল, 'পক্ষিরাজ, আমার উপদেশ শোন—আমরা তোমাকে রাজা করব। তুমি আজ থেকে এখানেই থাক। আমি পাখিদের বলব যে সমুদ্রে এক বিহগ বাস করে; তিনি পাখিদের রাজা। তিনি আমায় জানিয়েছেন যেসব পাখি প্রতিদিন তাকে রাজা বলে সম্মান জানাবে তারাই এদেশে বাস করতে পারবে; আর যে পাখিরা তা মানতে রাজী নয়, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে তারা এখান থেকে পলায়ন করুক।'

তারপর পক্ষিরাজ বলল, 'তুমি যদি করতে পার, তবে তাই কর। কিন্তু আমি যখন রাজা হব তখন তোমাকে আমার মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে।'

পরদিন কাক পাখিদের জানাল, 'পাখিগণ শোন, গতকাল আমি এখানে এক দৈববাণী শুনেছি। সেই বাণী এরূপ—ওহে কাক, তোমরা সবাই মিলে পক্ষিরাজকে তোমাদের রাজা কর। যে পাখিরা এই নিয়ম মানতে রাজী তারা এই পর্বতে বাস করবে; বাকী সকলে সরে পড়। আমি তোমাদের সাফ জানিয়ে দিলাম; যা বলা হয়েছে তাই কর।' তখন আমি পাখিদের বললাম, 'পক্ষিগণ, এ তো ভালোই; কেউ কারো উপর বলৎকার করবে না। আমরাও তাই চাই।'

তারপর আমরা সকলে মিলে দূর্বা প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাকে রাজা বানালাম। তখন সেই রাজা কাককে ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন এবং তারপর আমাকেও মন্ত্রীর পদ দিলেন। সমস্ত ঘটনাই আপনার কাছে নিবেদন করলাম।'

সেই কাকের চরিত্রমাহাত্ম্য শুনে আমি (সেক) উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলাম, 'পাখিরা সব দিগ্‌বিদিকে উড়ে যাক।' আমার কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা উড়ে গেল। কিন্তু যে পাখিদের ডিম ও শাবক নষ্ট হয়েছিল, তারা খুবই কষ্টে পড়ল। তারপর শুক বিদায় নিতে চাইলে আমি (সেক) শুককে বললাম, 'আমি রত্নদ্বীপ দেখতে চাই।'

শুক—রত্নদ্বীপ দেখতে চান কেন?

আমি—পূর্বে কখনো দেখিনি তাই।

শুক—যাওয়ার কথা শুনতেই ভালো লাগে, কিন্তু প্রকৃত স্থান অতি দুর্গম। একশ জন গেলে একজনও ফিরে আসে কি না সন্দেহ।

আমি—শুক, সেই ব্যাপারে কিছু বল।

শুক বলতে শুরু করল—'একবার এক বণিক বহু রত্নের লোভে রত্নদ্বীপে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে নদীর তীরে ঘাস বিছিয়ে আগুন জেলে তার মধ্যে খই আহুতি দিতে লাগলেন। তা দেখে পাখিরা উড়ে এসে মনের আনন্দে সেই খই খেতে লাগল। এভাবে সেই বণিক বহু রত্ন সঞ্চয় করলেন। তারপর নৌকায় উঠে ফেরার পথে তাঁর নৌকায় হাওয়া লাগল। সেই সময় এক পক্ষী ও পক্ষিণী ঝড়ের বেগে নৌকার উপর উড়ে এসে পড়ল। তারপর পারাবত যেমন চালের কণা খুঁটে খায়, ঠিক সেইভাবে ঐ পক্ষি ও পক্ষিণী নৌকার আরোহীদের ভক্ষণ করতে লাগল। বণিকের কয়েকজন ভৃত্য কোন উপায়ে নৌকা থেকে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল। কিন্তু গুহার মধ্যে বসবাসকারী পদ্ম ও মহাপদ্ম নামক দুই সাপ তাদের খেয়ে ফেলল। যারা সাপের মুখ থেকে পালিয়ে বাঁচল তাদের কয়েকজনকে বাঘে খেল। আর কয়েকজন ভয়েই মারা গেল। সমুদ্রের মধ্যে সেই নৌকায় বণিকের সমস্ত ধনসম্পদ রয়ে গেছে। এই ঘটনার পরেও আপনি কেন রত্নদ্বীপে যেতে চান?'

সমস্ত কাহিনী শুনে আমার মনে খুব দুঃখ হল। তাই বললাম, 'সেই সাধুর কোথায় দেশ, কোন গ্রামে জন্ম কিছুই জানা গেল না! তার ভাগ্যে এমন ছিল তাই আল্লাহ্ এমন কঠোর আচরণ করলেন।'

আমি পুনরায় বললাম, 'নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইতস্তত কর্ম সম্পন্ন করেন; কিন্তু খোদাতাল্লা মনে মনে যার জন্য যা ঠিক করে রেখেছেন, তার কর্মফল সেইমতো হয়।

আমার কথা শুনে শুক বলল, 'এই সাধু লোভের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, আপনি আল্লার দোষ দিচ্ছেন কেন? কারণ—নিত্য সঞ্চয় করা কর্তব্য, কিন্তু অতিসঞ্চয় করা উচিত নয়; তাই দেখুন এই অতিসঞ্চয়ী বণিক পাখির আক্রমণে মারা গেলেন।

শুক আবার বলল, 'আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সব কথা সবিস্তারে বলেছি। এখন আপনার আগমনকাহিনী আমি শুনতে চাই।'

আমি (সেক) সহাস্যে বলতে শুরু করলাম—লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম এই পর্বতে সৌগন্ধিক নামে গাছ আছে। সেই গাছের গন্ধে তৃষ্ণা দূর হয় এবং ফলে ক্ষুধা দূর হয়। কিন্তু এখানে পৌঁছে সে রকম কোন প্রমাণ পেলাম না। তারপর একদিন দুই বাঘ এসে আমাদের জানাল তারা আমাদের দুই ভাইকে ভক্ষণ করতে এসেছে।

আমাদের কাছে বাধা পেয়ে বাঘেরা আবার বলল, 'এখানে যারা আসে, তারা আর ফিরতে পারে না।' এখন তুমি বল এ ব্যাপার কি সত্য না মিথ্যা?

শুক বলল, 'মশায়, বাঘেদের কথা সত্য। তবে যারা নির্বোধ, তারা এখানে এলে বাঘের খাদ্য হয়; কিন্তু যারা জ্ঞানী—দেবতা অথবা মানুষ যাই হোন, এখানে এলে পূর্ণিমার রাত্রিতে পর্বত-শিখরনিবাসী এক সিংহের গর্জন শুনে মারা যায়। ঐ সিংহটি মহাদেবের ভৃত্য।'

একথা শুনে আমরা দুই ভাই খুবই বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আমরা কি স্বদেশে ফিরতে পারব না!'

শুক বলল, 'আপনারা স্বেচ্ছায় এমন কাজ করেছেন। কারণ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা দিয়ে চলেন, এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরের দেশ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা না করে স্বদেশ ত্যাগ করা উচিত নয়।'

তারপর আমি শুককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেই সিংহ পূর্ণিমার রাত্রিতে গর্জন করে কেন?'

শুক বলল, 'সেদিন মহাদেবের সম্মুখে নারদ বীণা বাজান এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করেন। তাই কোন পুরুষ এখানে অবস্থান করতে পারে না। মহাদেবের আদেশে ঐ সিংহ গর্জন করে। আগামীকাল পূর্ণিমা, আপনি আজ স্বদেশে ফিরে যান। এই জায়গার পরেই এক দুর্গম নদী আছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশে তার জল স্পর্শ করে, তার দেহ পাথরে পরিণত হয়। সেই নদীর পরে আর এক নদী আছে। সেখানে নৌকা রয়েছে। যদি দেখতে চান তাহলে পূবদিকে গমন করুন।'

একথা জেনে আমি (সেক) সৌগন্ধিক গাছের কিছু ফল আহরণ করে ভাইয়ের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে এলাম।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

আট

মহাজ্ঞানী সেক দেশে ফিরলে লোকে মিথ্যা বদনাম দিয়ে বলতে লাগল, 'সাধুর বেটিকে ছেড়ে দিয়ে আবার হাজির হয়েছে।'

শেঠ রমজান লোকমুখে এই অপবাদ শুনে সেকথা রাজার গোচরে আনলেন, 'রাজাধিরাজ হোসেনশা, বিজয়রাজ্যে বিজয়ী হোন। আমি আপনার রাজ্যে বাস করি। কাফুর নামে এক গরিবের পুত্রকে জামাই করতে চেয়েছিলাম। বার বছর পর্যন্ত সেই কাফুরকে সপরিবারে ভরণ-পোষণ করলাম। এখন ঐ কাফুরের পুত্র আমার বেটিকে সাদি করুক, নতুবা আমি যা খাওয়া-পরা দিয়েছি তার দাম ফেরৎ দিক। তার বাপ-মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। লোকজন বলছে, 'সাধুর কন্যাকে গ্রহণ করে এখন কি অপরাধে তাকে ছেড়ে দিল?' আমি আপনাকে জানালাম; যা উচিত তাই করুন।'

বাদশা বললেন, 'ওহে সাধু, আপনি একজন পদাতিক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যান। তাকে ধরে আনুন। আমার বুদ্ধিমত বিচার করে তার শাস্তি বিধান করব।'

সাধু রমজান ভাই গরীবের সঙ্গে আমাকে (সেককে) বাদশার কাছে হাজির করলেন। তারপর শেঠ রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, 'এই সেক আমার বেটিকে গ্রহণ করছে না, আবার আমার টাকাকড়িও ফেরৎ দিচ্ছে না।'

বাদশা অমাত্যদের বললেন, 'সেক কি বলে ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

অমাত্যরা আমাকে বললেন, 'ওহে হতভাগ্য সেক, বাদশা

তোমাকে জিজ্ঞাসা করছেন এই সাধুর কন্যাকে কেন সাদি করছ না? তার টাকাকড়িই বা কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ না?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে বাদশা?'

কেউ একজন বললেন, 'বাদশা হলেন বীর সাহসী নিঃশঙ্ক হোসেনশা।'

আমি বললাম, 'ওহে নির্বোধ অমাত্যের দল, সেই লোকটি তো আমাদের মতই সাধারণ, তাহলে সে আমাদের বাদশাহ হবে কেমন করে! মালিক আমাদের রাজা। আমি যেমন সাধারণ মানুষ, তোমাদের বাদশাও তেমন।'

তারপর লোকজন আমার উপর উৎপীড়ন করতে লাগল আর বলল, 'শাহানশা, এ লোক আপনাকে বাদশা বলে মানতে চায় না। আজ্ঞা করুন এর কি শাস্তি হবে।'

বাদশা বললেন, 'একে কোতল কর।'

তখন আমার ভাই গরিব বলল, 'শাহানশা, একে ক্ষমা করুন। আমার এই ভাইটি বাতুল, এর হয়ে আমি আপনাকে সেলাম জানাচ্ছি।'

বাদশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার ভাইকে বললেন, 'বেচারা গরিব! এর কথা শুনেই আমার হৃদয় গলে গেল।'

ঠিক এই সময় আমাদের বাবা-মা সেখানে হাজির হলেন। তারপর আমার বাবা বললেন, 'বাদশা, আমার পুত্রদের ছেড়ে দিন। আমি সাধু রমজানের টাকাকড়ি ফিরিয়ে দেব।'

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গরিব, শেঠের ধন ফিরিয়ে দেবে কী করে?'

আমার ভাই বলল, 'বাদশা, আমি আর আমার ভাইজান আমাদের পিতার সম্পদ। আমাদের দুজনকে বিক্রি করে তাঁরা সাধুর টাকাকড়ি ফিরিয়ে দিন।'

রাজপুরুষেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমারও কি এই মত?'

আমি বললাম, 'কখ্‌খনো না। যে পৃথিবী সকলকে জন্ম দেয় সেই আমাদের মা। যিনি সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন, তিনি আমাদের বাবা।'

তখন বাদশা আমাদের বাবাকে বন্দী করে ফরমান দিলেন, 'যতদিন না সাধুর ধন ফিরিয়ে দাও, ততদিন আটক থাক।'

আমার ভাই বলল, 'বাদশা, ধর্ম ত্যাগ করবেন না। আমরা দুভাই বর্তমান থাকতে বাবা বন্দী থাকবেন? আমার ভাই সেকের কথায় কি এসে যায়! আমাদের দুজনকে হাটে বিক্রি করে সাধুর ঋণ শোধ করুন। ঋণ শোধের অতিরিক্ত যা থাকবে তা বাবা গ্রহণ করবেন।'

বাদশা আমাদের পিতাকে বললেন, 'কাফুর, তুমি শত মুদ্রা নাও; আমি সাধু রমজানের ঋণ শোধ করব। তুমি শুধু চুক্তিপত্র কর।'

তারপর বাবা-মা ভয়ে চুক্তিপত্রে সম্মতি দিলেন; কারণ— ক্ষুধার্তা নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করে; ক্ষুধার্তা সাপিনী আপন ডিম ভক্ষণ করে; ক্ষুধার্ত মানুষ কোন্ পাপই না আচরণ করে? ক্ষুধার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ দয়ামায়া ভুলে যায়।

অতঃপর পিতামাতা বণিককে প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরলেন।

'আমার বাড়িতে চলো'—বাদশা আমার ভাইকে একথা বলে বিদায় দিলেন। ভাই চলে যাওয়ার পর আমিও গেলাম।

তারপর ভাই আমাকে বলল, 'ভাইজান, আমি বাবা-মাকে ঋণমুক্ত করেছি।'

আমি বললাম, 'তুমিও ঘরে চল।'

ভাই আমাকে বলল, 'বাবা-মা আমাকে রাজার কাছে বিক্রি করেছেন। এখন কী করে যাই?'

আমি ভাইকে বললাম, 'তুমি মূর্খ। বিক্রেতা একজনই

আছেন।' কথা শুনে ভাই বলল, 'ভাইজান, তুই কি আমায় মেরে ফেলবি? তোর যেমন কথাবার্তা আমি প্রাণে মারা পড়ব।' অবশেষে আমরা দুই ভাই রাজার বাড়িতে পৌঁছালাম। কিছুক্ষণ পর পাচকেরা আমাদের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট অন্নপানাদি পাঠিয়ে দিলেন।

ভাই বলল, 'তুমি আগে খাও।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এ অন্ন আমি খেতে রাজী নই, কারণ তার পরিণামে বিষভক্ষণের ফল ফলবে।'

ভাই বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও। পাগলের মতো প্রলাপ বকছ; এসব কথা বাদশার কানে গেলে জান থাকবে না। বাদশা আমাকে কিনে নিয়েছেন; সুতরাং তিনি যা দেবেন, তাই খেতে হবে। আমাদের বিনাশের মূলে তুমি; আমাদের কোন কথাই শুনছ না।'

আমি কিন্তু সেই খাবার খেলাম না, আমার অনুরোধে ভাইও খেল না। এই সময় বাদশা এক মসজিদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পাথর আনতে কয়েকজন লোককে পাঠালেন। ভাইয়ের সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। বাদশা গরিবকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা সবাই মিলে মসজিদের দরজায় পাথর বয়ে আন। পাথর আনা চলতে লাগল। সেখানে মস্ত এক পাথর ছিল, অনেকে মিলেও তুলতে পারল না। তারপর আমি সেই পাথর ধরলাম এবং খেলাচ্ছলে সেটিকে তুলে এনে সেই মসজিদের দরজায় নামিয়ে দিলাম। এই ঘটনা দেখে বাদশা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'সেক, তুমি ধন্য!'

অতঃপর বাদশা প্রাসাদে ফিরে এলেন। আমাদের দুই ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বৎস, সভা মধ্যে তুমি আমাকে অপমান করেছিলে কেন? আমি কি অন্যায় করেছিলাম? তাছাড়া কি কারণেই বা পিতামাতার নিন্দা করেছ?

কেনই বা সাদি করছ না?' বেগমসাহেবা মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সানুনয়ে আমাকে এসব প্রশ্ন করলেন।

তারপর আমাদের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন আনীত হল। তা দেখে আমার ভাই বলল, 'বাদশা, লবণ ছাড়া কিছু খাবার দিতে বলুন।' লবণহীন খাবার আনা হোল। বাদশা ও ভাইয়ের অনুরোধে আমি সেই খাবার খেলাম। ভোজনপর্ব শেষ হলে বাদশা ও অমাত্যগণ আমাদের দুই ভাইকে অনুরোধ করে বললেন. 'সেক, তুমি শেঠ রমজানের সেই কন্যাটিকে সাদি করতে অনিচ্ছুক কেন? এ কেমন ব্যাপার?' বাদশা ও বেগম বারংবার সেই একই কথা বলতে লাগলেন।

এসব কথাবার্তা চলতে লাগল। হঠাৎ বাদশা বেগমের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমাদেরও তো একটি মেয়ে আছে, সেক তাকেই সাদি করুক।'

কথা শুনে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বললাম, 'আমায় মাফ করুন।'

কথা শুনে বাদশা ও পারিষদ্‌বর্গ বাক্‌শক্তি হারিয়ে বোবার মতো বসে রইলেন। এভাবে নানান কৌতুকালাপে সেই দিনটি অতিবাহিত হতে চলল। সকলে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু কেউই কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না।

অতঃপর ভাই গরিব আমাকে বলল, 'দাদা, তুমি এই বাদশার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি নিজে এর খাতক। তুমি এঁকে বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে দাও। তারপর এঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে তুমি এখান থেকে বিদায় নিও। এদের সকলকে কথা বলার শক্তি ফিরিয়ে দাও।'

ভাইয়ের অনুরোধে আমি তখন বাদশা ও পারিষদ্‌বর্গকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আপনারা কথা বলুন।' আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই তারা পুনরায় বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন।

তখন বাদশা আমার পা ছুঁয়ে বললেন, 'অনুগ্রহ করুন। আমরা আপনাকে কুকথা বলেছি, আমাদের ক্ষমা করুন।'

আমি তাঁকে বললাম, 'বাদশা, ভয় পাবেন না।'

এরপর তিনি আমাকে ও ভাই গরিবকে আর্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনারা আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন; স্বকীয় বিভূতির কথা বলুন। যিনি সিদ্ধ জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানই সার, আর সব মিথ্যা।'

আমি পুনরায় বললাম, 'মালিক ছাড়া আর কাউকে জানি না। তাই বলি—কে আমার মাতা, কে আমার পিতা, কে আমার সহোদর, কেই বা আমার মন্ত্রী? সমানচিত্ত লোকেদের মধ্যে কেই বা রাজা হবার যোগ্য? এই আমার মত। জ্ঞানীরা বলেন—এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার অনাত্মীয়। লঘুচেতা মানুষই এমন বিচার-বিবেচনা করেন। কিন্তু যারা উদারচেতা, তারা সকলকেই আত্মীয়রূপে গণনা করেন। সদুক্তি শুনুন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার এই পাঁচটি সর্বদা প্রাণীর প্রাণঘাতক হয়। শাস্ত্র থেকে আপনার কোন শিক্ষা লাভ হয় নি। আপনারা সব সম্পদের অধিকারী, তবু আপনারা কেন বলছেন যে কোন কিছু করার শক্তি নেই? অধিকন্তু অপনারা বলছেন যে যারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারে, তারাই ভাগ্যবান। পূর্ব জন্মের কর্মফলে যা সঞ্চিত নেই, আপনারা তাই লাভ করার চেষ্টা করছেন, কারণ—ফলচ্ছায়াযুক্ত মহাবৃক্ষকেই সেবা করা উচিত; যদি দৈবাৎ ফল না থাকে, তাহলেও তার ছায়াকে আশ্রয়ের সুযোগ থেকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এই সমস্ত প্রশ্নের বিচার খুবই কঠিন। কোন পথিক যেমন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে বিশ্রাম করে এবং তারপর সেখান থেকে চলে যায়, এই পৃথিবীতে প্রাণীদের জন্মও সেরূপ। তাই আপনার এবং আমার মধ্যে বস্তুত কোন ভেদ নেই। আপনারা বাদশা, দেশে দেশে আপনাদের সেনাপতিরা রয়েছেন। যিনি রাজকার্যে নৈপুণ্য

দেখান, তিনি আপনার প্রিয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার আদিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে অসমর্থ, আপনি তো তাকে হিংসা করেন না। সর্বত্রই এই রকম বুঝে নিতে হবে। পশুবুদ্ধি মানুষ সব কাজে যুক্তি অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। যেমন দেখুন গো-নকুলাদি জন্তুরা প্রাকৃতিক সময় অনুসারে স্ত্রীসঙ্গম করে, কিন্তু মানুষ কামবেগ দমন করতে পারে না বলেই ইচ্ছামত স্ত্রীমিলনে প্রযুক্ত হয়।'

এভাবে নানা কথার আলোচনায় রাত্রি কাটল। পরদিন সকালেই বাদশা আমাদের পিতামাতাকে আনলেন এবং সেই শেঠকেও আনলেন। তারপর ভীত বাদশা সবার সম্মুখে বললেন, 'ওহে কাফুর, আপনি পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যান; আমি আপনার কাছে কোন ক্ষতিপূরণ চাই না। অধিকন্তু আমার আদেশে আপনাদের বাসস্থানের জন্য বাদশাকে কোন কর দিতে হবে না। এখন থেকে আমি আপনাদের কেনা গোলাম দাসানু-দাস; আপনারা যা আদেশ করবেন, তাই করব।' এই বলে তিনি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানালেন। তারপর সেই সাধু রমজানকে গলায় হাতবাঁধা অবস্থায় আমার কাছে সমর্পণ করলেন।'

আমি বললাম, 'শাহানশা, লোকটিকে মুক্তি দিন।'

আমার কথা শুনে বাদশা তাকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি লাভ করেই রমজান তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন। কিন্তু আয়াসী খবর পেল তার পিতা রাজদরবারে বন্দী রয়েছেন। তখন সে কাজী শিরাজের আরদালীকে সঙ্গে করে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমার বাবা-মা ও ভাই তিনজনেই তাকে মারতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আমি সকলকে বাধা দিলাম।

আয়াসীর অভিযোগমত আমি কাজির কাছে হাজির হলাম। বাদীর পক্ষে আয়াসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 'এই সেকের পিতা আমার পিতার কাছে পঞ্চাশ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছেন। আমার ভাবী স্বামী এই সেক রাত্রিতে আমার সঙ্গ

পটেভাগ করে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাইছেন না। সবকিছু আপনার গোচরে আনলাম; জেনে শুনে আপনি এর বিহিত করুন।'

কাজী আমাকে বললেন, 'অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিন।'

আমি বললাম, 'বাদীর অভিযোগ মিথ্যা।'

আয়াসী জিজ্ঞেস করল, 'এর ভাইকে বাদশার বাড়ীতে কেন বিক্রি করা হয়েছিল? ইনি কেন আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছেন না?' আমি উত্তর দিলাম, 'এই নারী পাপিষ্ঠা; আমি একে গ্রহণ করতে রাজী নই।'

আয়াসী বলল, 'তবে আপনি আমার সঙ্গে সহবাস করলেন কেন? এখন কে আমাকে সাদি করবে?'

কাজী আয়াসীকে বললেন, 'সেক আপনার সঙ্গে সহবাস করেছেন, তার সাক্ষী আছে কি?'

আয়াসী বলল, 'হাঁ।'

কাজী—কে সাক্ষী বলুন?

আয়াসী—প্রথমে সেককে জিজ্ঞাসা করা হোক যে তিনি এক শয্যায় আমার সঙ্গে শয়ন করেছিলেন কি না?

আমি—এক শয্যায় শুয়েছিলাম; তাতে কি হয়েছে?

আয়াসী—উনি কি আমার স্তনে হাত দিয়েছিলেন?

আমি—হ্যাঁ দিয়েছিলাম; তাতে কি হয়েছে?

কাজী—অনেক সময় ছোট রাস্তায় পথ চলতে গেলে দুজনের শরীরে ধাক্কা লেগে যায়; তার দ্বারা কি প্রমাণ হয়? সেটা দোষের নয়। আর কি হয়েছিল বলুন।

আয়াসী—স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের সংযোগও ঘটেছিল।

আমি—সেকাজ আমার মতের বিরুদ্ধে ঘটেছিল।

সব কথা শুনে লোকে আমার নিন্দা করতে লাগল। তারা বলল, 'সেক পরাজিত। আয়াসী জয়ী।'

কাজী বললেন, 'এই সেক পণ্ডিত ও বিবেকবান ব্যক্তি; তাঁকে কোন শাস্তি দিচ্ছি না। সেক আয়াসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। আয়াসী, আপনি আমার আদেশবলে সেককে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে যান। বাদশা বিচার বোঝেন না।'

তারপর আয়াসী আমাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরল। আমি তাদের বাড়িতে কয়েকদিন অনাহারে কাটালাম। একদিন রাত্রিতে আয়াসী আমাকে বলল, 'হে মহাজ্ঞানী, লোকে বলে আপনার কথায় আমি মরতেও রাজি হব।'

আমি বললাম, 'অবলা, তোমার কোন দোষ নেই। আমার জন্যে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ।'

আয়াসী বলল, 'আমি ন্যায়বিচারে আপনাকে জয় করেছি।'

আমি বললাম, 'মিথ্যা কথায় জয়লাভ করেছ।'

আয়াসী বলল, 'আপনার জন্যে আমার পিতার কিছু ধন নষ্ট হয়েছে। আমি আপনার সব অনর্থের মূল এই ভেবেই আপনি আমাকে গ্রহণ করেছেন। আপনি এখনও আমাকে ভালোবেসে গ্রহণ করছেন না। তাহলে আমার মরণই ভাল।'

তার কথা শুনে আমি বললাম, 'তোমার মরণ হলে আমার কি? আমার মরণ হলে তোমারই বা কি!'

আয়াসী বলল, 'হে মহাসত্ত্ব, আমি আত্মহত্যা করলেও অপবাদ ঘুচবে না। লোকে বলবে বণিকের বেটির নিশ্চয় কোন দোষ ছিল, তাই স্বামী তাকে ঘরে নিতে চায় নি।'

এভাবে আয়াসী অনেক কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু তথাপি আমি তাকে সাদি করলাম না।

আয়াসী আবার বলল, 'লোকনিন্দা খুবই কষ্টদায়ক। এখন যদি আপনি ক্রোধবশে আমাকে অভিশাপ দেন, তাও আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমার অদৃষ্টে এমন পুণ্যফল নেই যে আপনার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করব। তবু অন্তত আজ একবারের মত

আমার হাতে সামান্য মিষ্টান্ন মুখে দিন, তাহলে আমার মনের সব কষ্ট দূর হবে।'

তার মুখে একথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোল। ভাবলাম আয়াসী হয়ত দুঃখে আত্মহত্যা করবে! তাই তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'প্রিয়ে তুমি যা বলেছ সেই মত মিষ্টান্ন ভোজন করাও, আমি খেতে প্রস্তুত।'

আয়াসী উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আপনি আদেশ করুন, খাবার তৈরি করি।'

মিষ্টান্ন প্রস্তুত হলে আমি বললাম, 'বণিককন্যা আমি তোমার প্রস্তুত মিষ্টান্ন খেতে পারি, যদি আমার কথা রাখ।'

আয়াসী বলল, 'আপনি যা আজ্ঞা করবেন তাই করব।'

তারপর আমি আয়াসীর হাতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে বললাম, 'আমি তোমার কথা রক্ষা করেছি ; এবার তুমি আমার কথা রক্ষা কর—তোমার মৃত্যু হলে আমি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করব ; কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করে সাদি করব না। আমার ভাই গরিব আমারই মতো। তুমি তাকেই গ্রহণ কর।'

আয়াসী লজ্জা পেয়ে বলল, 'আপনার আদেশ মাথায় করে সেইমত কাজ করব। তবে তিনিও যদি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করেন, তবে বুঝব স্বামীর খোঁজেই আমার জন্ম গেল।'

আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছা গরিবের সঙ্গে তোমার সাদি হোক। এভাবে শপথ করে আয়াসী আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খাওয়াদাওয়া করল। আমি বাবা মা ও ভাই গরিবকে সব কথা জানালাম। তখন গরিব বলল, 'ভাইজান, তোমার কথা যুক্তিযুক্ত নয়, তিনি হলেন বড় ভাইয়ের স্ত্রী।'

আমি বলাম, 'আমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাই না। তাছাড়া, আমি এখানে থাকব না। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে পুরাণ-পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। আমি সেখানে যাব।'

তারপর আয়াসার পিতা রমজানকে ডেকে সব কথা জানান হোল। উদ্‌গ্রীব শেঠ ভাবলেন এমন ব্যবস্থায় তিন দিক রক্ষা হবে। তিনি সম্মত হলেন। বিবাহ সম্পন্ন হলে আমি শেঠের কাছে সমুদ্রযাত্রার জন্য একটি নৌকা চাইলাম। তিনি নৌকা ও মাঝির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মাঝিরা আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। তারপর আমি নৌকাকে আদেশ করলাম, 'হে নৌকা, সমুদ্রমধ্যে যেখানে সেই পুরাণ-পুরুষ বর্তমান, সেখানে চলো।' আমার আজ্ঞামত নৌকা সেই স্থানের অভিমুখে ভেসে চলল।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ সেকের বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

নয়

পুরাণ-পুরুষের আজ্ঞা প্রাপ্তি

সেক এরূপ নানান কথাবার্তার পর মৌনী হলেন। কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেলেন না। কিছুক্ষণ পর সকলে সেককে বললেন, 'আরও কিছু বলুন।'

তারপর রাজা পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং অবনতমস্তকে বললেন, 'আমাদের মন এখনও তৃপ্ত হয় নি। আপনি আরও কিছু বলুন।'

সেক বলতে লাগলেন—"তারপর আমি সমুদ্রের মধ্যে পৌঁছে অত্যুজ্জ্বল ও আশ্চর্যজনক একটি স্থান দেখতে পেলাম; সেখানে কতিপয় সিদ্ধ পুরুষ উপস্থিত রয়েছেন। এক মণ্ডপের মধ্যে পূর্ব-

কথিত পুরাণ পুরুষ বর্তমান ; তিনি মধ্যবয়স্ক। আমি ধীরে ধীরে তাঁর সম্মুখে হাজির হলাম।

সেই সময় কোন একজন বলে উঠলেন, 'কে তুমি ? বিনা অনুমতিতে কেন হাজির হয়েছ ?'

পুরাণ-পুরুষ বললেন, 'ওকে আসতে দাও।'

তারপর আমি আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। মাটিতে মাথা নুইয়ে তাঁকে সেলাম জানালাম।

পুরাণ-পুরুষ আমাকে বললেন, 'আপনি এখানেই থাকুন ; কোন সংশয় করবেন না। তবে আরও কিছুকাল পরে আপনার এখানে আসা উচিত ছিল।'

আমি বললাম, 'কর্তা, অনেক দুঃখ পেয়ে এখানে এসেছি। তাই হে গোস্বামিপাদ আমাকে উপেক্ষা করবেন না।'

পুরাণ-পুরুষ বললেন, 'আপনি পরের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। তাহলে পাখীদের অভিশাপ দিলেন কেন ?'

তাঁর কথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'বাইরে অপেক্ষা করুন।'

পুরাণ-পুরুষ বললেন, 'ইনি কর্মী পুরুষ ; এখানেই থাকুন। এর সঙ্গে আপনারা আলাপ করুন। ইনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দমন করেছেন।'

তারপর আমি কয়েক দিন সেখানেই কাটালাম। একদিন সমুদ্রতীরে যোজনবিস্তৃত শুভ্র জ্যোতি দেখলাম। আমি পরম জ্ঞানী পুরাণ-পুরুষের অনুচরদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটি কি বস্তু দেখা যাচ্ছে ?'

তারা বললেন, 'ঐ বিস্তৃত প্রদেশ পদ্মযোজন নামে খ্যাত। দেখার ইচ্ছা থাকলে আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা ওখানেই যাব।'

তারপর সকলে সেখানে পৌঁছালেন। তারা সেখানে কিছু

ফুল তুলে ঘরে ফিরতে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় দুটি মহামূল্য রত্নহার তাদের চোখে পড়ল। তারা একটি হার আমার হাতে অর্পণ করলেন। কিন্তু আমি সেই হার গ্রহণ না করে সেখানেই রেখে দিলাম। অবশেষে সকলে সমুদ্রতীর থেকে ফিরে এলেন।

ইন্দ্রের অপ্সরাগণ সমুদ্রতীরে ঐ স্থানে ফুল তুলতে এসে ভুলবশত হারদুটি ফেলে রেখে স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপ্সরাগণ, তোমাদের হার কোথায় গেল?'

তারা উত্তর দিলেন, 'প্রভু, ফুল তুলতে গিয়ে আমরা হারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

ইন্দ্র বললেন, 'তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে যাও।'

অপ্সরাগণ সত্বর সেখানে ফিরে এসে একটি মাত্র হার খুঁজে পেলেন এবং সেটি সঙ্গে করে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সমর্পণ করলেন। পুরাণ-পুরুষের অনুচরগণ অপ্সরাদের যে হারটি সঙ্গে করে তাঁর কাছে ফিরেছিলেন, সেই মুক্তাহার থেকে প্রদীপের আলোর মতো সামান্য আলোও হোল না। তখন তারা পুরাণ-পুরুষকে জানালেন, 'আমরা দুটি মুক্তাহার পেয়েছিলাম।'

পুরাণ-পুরুষ ক্রোধবশত কোন কথাই বললেন না।

ইন্দ্র সেই দুই অপ্সরাকে অভিশাপ দিলেন, 'পাপিষ্ঠা তোমরা শূকরজন্ম লাভ করে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও; যে মুক্তাহারটি ফেলে এসেছ, সেটি পুনরুদ্ধার করলে তবে স্বর্গে ফিরতে পারবে।'

ইন্দ্রের অভিশাপে দুই অপ্সরা শূকরী রূপে জন্ম নিলেন।

অনন্তর একদিন আমি সেই পুরাণ-পুরুষকে বললাম, 'প্রভু, আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দেখতে পাই না কেন?'

পুরাণ-পুরুষ বললেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষাৎ দেখতে পাবে; কিন্তু তার সময় এখনও আসে নি। এখন আমার উপদেশ শোন—তুমি পূর্বদেশে যাও; সেখানে মহারাজ লক্ষ্মণসেন রাজত্ব

করেন। তাঁর রাজত্বে যে কেউ যবন যায়, তাকেই হত্যা করা হয়। সেই রাজাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। তুমি হিন্দুদের ভাষা জান। সেই রাজাকে একটি দেবমন্দির দান করে চোদ্দ ভুবন ভ্রমণ করে তুমি এখানে ফিরবে। তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে তোমার অভিজ্ঞতার কাহিনী সব শুনব।'

তাঁকে প্রণাম করে আমি পুনরায় বললাম, 'সমুদ্রে গমনকালে যদি কেউ আমাকে হত্যা করতে আসে, তখন কে বাঁচাবে?'

পুরাণ-পুরুষ আমাকে বললেন, 'আমার মস্তকে রক্ষিত এই রক্ষাকবচটি সঙ্গে নিয়ে যাবে।' একথা বলে তিনি সেই কবচটি আমাকে দান করলেন। তারপর একটি জলপূর্ণ পাত্র দিয়ে বললেন, 'এই করবাল কখনো জলশূন্য হবে না। এর জল পান করলে ক্ষুধা-পিপাসা দূর হবে।' অতঃপর একটি দণ্ড দান করে বললেন, 'এই দণ্ড দেখে কেউ অসদভিপ্রায়ে তোমার কাছে আসতে সাহস পাবে না।' পুনরায় একজোড়া পাদুকা দিয়ে বললেন, 'এই পাদুকা পায়ে দিলে তুমি জলে স্থলে অগ্নিতে যেখানে খুশী ভ্রমণ করতে পারবে। বজ্র ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকে তোমার ভয় থাকবে না। তবে বজ্র থেকেও আত্মরক্ষার উপায় আছে, শোন—সেই দুই অপ্সরার হার আমার কাছে আছে; তুমি হার সঙ্গে নিয়ে যাও। সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখবে ঐ দুই অপ্সরা শূকরী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি তাদের হার ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রের কাছে তোমার জন্য কিছু প্রার্থনা জানাতে অনুরোধ করবে। তখন ইন্দ্র তোমাকে বর দান করবেন—আমার বজ্র সকলকে ধ্বংস করবে, কিন্তু অপ্সরাদের হার প্রত্যাবর্তন-কারীকে করবে না।'

এসব কথা বলে পুরাণ-পুরুষ আমাকে একটি বস্ত্র দান করলেন এবং তাঁর নির্দেশমত কাজে পাঠালেন। আমি সেই কাপড়

মাথায় বেঁধে পাদুকা পরিধান করে জলপাত্র ও লগুড় হাতে নিয়ে তাঁকে সেলাম জানিয়ে সমুদ্রের অভিমুখে রওনা দিলাম। আগমনকালে এক স্ফটিকপুরী চোখে পড়ল। আমি সেখানে প্রবেশ করে দেখলাম রাজা চণ্ডসিংহ ও তাঁর পত্নী রয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'ওহে কোথায় চলেছ?'

আমি বললাম, 'পূর্বদেশে গৌড়রাজ্যে লক্ষ্মণসেন নামে সমর-বিজয়ী সার্বভৌম রাজার কাছে চলেছি। শুনেছি সেই রাজা কাউকে ভয় পান না।'

রাজা চণ্ডসিংহ বললেন, 'তুমি তো যবন, তাহলে তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যদি প্রাণটি হারাতে না চাও, তবে যাত্রা বন্ধ কর। আমার এখানেই থাক।'

আমি বললাম, 'তিনিও রাজা, আপনিও রাজা; কোন পার্থক্য নেই। আপনি এতকাল সমুদ্রতীরে রয়েছেন কেন?'

রাজা চণ্ডসিংহ বললেন, 'আমি এখন রাজ্যহারা অপুত্রক বনবাসী। তাই সমুদ্রতীরে বাস করছি। তুমি আজকের দিনটি এখানেই থাক। আগামী কাল যাত্রা করবে।'

সেই দিনটি আমি তাঁর সঙ্গেই কাটাতে মনস্থ করলাম। চণ্ডসিংহের পত্নী আমার জন্য আহারের ব্যবস্থা করে বললেন, 'আগামীকাল আপনার প্রাণ থাকবে কি না কে জানে। এই অন্নটুকু গ্রহণ করুন।' আমি তাঁর প্রদত্ত অন্ন আহার করলাম।

পরদিন প্রভাতে সমুদ্রের তীরে দুটি শূকরী দেখতে পেলাম। আমার সংগৃহীত হারটি তাদের ফিরিয়ে দিলাম। হার গলায় পরামাত্রই শূকরীদ্বয় অপ্সরাদেহ ফিরে পেলেন। তারা আমাকে আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন এবং ইন্দ্রের কাছে সমগ্র ঘটনা নিবেদন করলেন। তাদের কথা শুনে দেবরাজ বললেন, 'আমার বজ্র সর্বত্র কার্যকরী হবে, কিন্তু ঐ হারপ্রদাতার কোন অমঙ্গল ঘটাবে না।'

সমস্ত ঘটনা দেখে চণ্ডসিংহের পত্নী রত্নবতী স্বামীকে বললেন, 'ইনি মহাত্মা ব্যক্তি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম ইনি সমুদ্রতীরে দুই শূকরীকে আপন অনুগ্রহে অপ্সরায় পরিণত করলেন। তাই এঁর কাছে আমিও কিছু প্রার্থনা জানাই।' এই ভেবে রত্নবতী আমাকে বললেন, 'হে মহাত্মা, আমি পুত্রহীনা, আমাকে অনুগ্রহ করুন।'

আমি তাকে একটি ডালিম ফল উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করলাম 'পুত্রবতী হোন।'

সেই ফলটি ভক্ষণ করে রত্নবতী গর্ভবতী হলেন এবং তারপর যথাকালে পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁদের পুত্রের নাম রাখা হোল প্রচণ্ডসিংহ। রাজা চণ্ডসিংহ আপন রাজ্য ফিরে পেলেন।

অবশেষে আমি চণ্ডসিংহের কাছ থেকে এখানে আসার ইচ্ছা জানালাম।

রত্নবতী বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনার অনুগ্রহেই আমরা সবকিছু ফিরে পেলাম। আমি আসলে নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের কন্যা; অভিশাপের প্রভাবেই এখানে আসতে হয়েছে। আপনি এখান থেকে যেতে চান, তাই আমরাও আপনাকে আর এখানে রাখতে পারব না। আপনাকে জানাই—সমুদ্রমধ্যে নারকেল গাছের মত বৃহদাকার সৌর এবং অসৌর নামে দুই সাপ বাস করে। তারা স্বেচ্ছায় মানুষকে গিলে খায়। এমন অবস্থায় কি উপায়ে সেই পথে যাবেন? তাই বলি আমাদের কাছে নাগমণি আছে; এই মণি দেখামাত্রই যে কোন সাপ বুক ফেটে মারা যায়।'

আমি সেই মণি ধারণ করে সমুদ্রপথে যাত্রা করলাম। সেই দুই সাপ আমাকে দেখেই খেয়ে ফেলতে উদ্যত হল। তখন আমি সেই মণিটি দেখানো মাত্রই দুই সাপ প্রাণত্যাগ করল। অতঃপর আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে এখানে পৌঁছালাম।"

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে সেকের মুখে আত্মকথা বর্ণনা সমাপ্ত।

দশ

যোগীর আত্মকথা

সেকের শুভাগমনে রাজ্যের প্রজারা তাঁর মঙ্গল গান গাইতে লাগল। সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

পরদিন সকলে সেকসমীপে হাজির হলেন। রাজা তখন যোগীকে বললেন, 'এখন আপনার কাহিনী শোনান।'

যোগী বলতে শুরু করলেন, "মহারাজাধিরাজ বিক্রমকেশরী নামে রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে বিত্তবান বণিক রত্নাকর বাস করতেন। রাজার আদেশমত সেই বণিক প্রকাণ্ড নৌকা সাজিয়ে বারো বছরের জন্য বিদেশে বাণিজ্য করতে গেলেন। কিন্তু বারো বছর পরেও তিনি দেশে ফিরে এলেন না। তখন তার স্ত্রী রত্নাবতী রাজসভায় হাজির হয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার আজ্ঞামত জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ আমার স্বামীর যাত্রার দিনক্ষণ স্থির করে তার জন্য পারিশ্রমিক নিলেন; কিন্তু স্বামী এখনও ফিরলেন না। এই সংবাদ আপনাকে নিবেদন করলাম। এখন আপনি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনুন এবং জ্যোতিষীর গৃহীত টাকা ফিরিয়ে দিন।'

রত্নাবতীর কথা চিন্তা করে রাজা বিক্রমকেশরী জ্যোতিষী ব্রাহ্মণকে হাজির করালেন এবং তাঁকে বললেন, 'আপনি বণিক-পত্নীর প্রশ্নের উত্তর দিন।'

রত্নাবতীর কথার উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন, 'বণিকপত্নী, আপনার কথা আমি বুঝেছি। আমি আপনার স্বামীর যাত্রার সময় নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট ক্ষণ স্থির করেছিলাম। কিন্তু বণিক সেই নির্দিষ্ট

ক্ষণে নিজের আংটিকে যাত্রা করিয়ে অন্য ক্ষণে নিজ যাত্রা করে-ছিলেন। আগামী কাল দুই প্রহরের মধ্যেই সেই আংটি আপনার উঠানের মধ্যে পড়বে ; এর কোন অন্যথা হবে না।'

রত্নাবতী বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তাই যদি হয়, তাহলে সেই আংটি ব্রাহ্মণকে দান করব। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে আপনি আমাদের কাছে ঋণী থাকবেন।'

এভাবে উভয়ের মধ্যে প্রতিজ্ঞা স্থির হল। বণিকপত্নী সেখানেই রইলেন। পরদিন রাজা অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে বণিকের বাড়ীতে সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে এলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন এক পঙ্গু ব্রাহ্মণ স্ত্রীর কাঁধে চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। বৃষ্টিতে পথ পিছল ছিল। অকস্মাৎ তারা দুজনেই রাস্তায় পড়ে গেলেন। পঙ্গু স্বামী কোন মতে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণীর কানের গোড়ায় এক চড় বসিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ওগো ব্রাহ্মণ, আমাকে মারধোর কর কেন ? আমি গর্ভবতী, কাঁখে পুত্রকে বহন করছি, কাঁধে তোমাকে বহন করছি। আমার কত শক্তি ?'

তারপর বণিকপত্নী রত্নাবতী সেই ব্রাহ্মণকে ধরে আনলেন। তিনি বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি আমার কাছে পাঁচ মুদ্রা ঋণ করেছিলেন। ঋণ শোধ করছেন না কেন ? ঋণের টাকা ফিরিয়ে দিন।'

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'কে আপনার কাছে ঋণ করেছিল ? আমি ঋণী নই।'

বণিকপত্নী বললেন, 'আপনার স্ত্রী আমার কথা মানছেন। তিনিই বলুন আপনি পঞ্চমুদ্রার ঋণী অথবা ঋণী নন।'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'ওগো বণিকপত্নী, আমরা গরিব, তাই আপনার ধার শোধ করতে অসমর্থ। ক্ষুধার্তা ভুজঙ্গী আপন অণ্ড ভক্ষণ করে ক্ষুধার্তা নারী আপন স্বামীকেও পরিত্যাগ করে, ক্ষুধার জ্বালায়

মানুষ কোন্ পাপই না করে? ক্ষুধায় কাতর হলে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। তাছাড়া আমার পুত্র রয়েছে, প্রয়োজন হলে একে বিক্রী করে ঋণ শোধ করব। নতুবা আমি আপনাকে কাঁধে চড়িয়ে বয়ে বেড়াব, না হয় আপনার বাড়ীতে দাসীর কাজ করব।'

একথা শুনে বণিকপত্নী ব্রাহ্মণীর পায়ের ধুলো নিয়ে ভক্তিভরে বললেন 'মা, এমন কথা বলছেন কেন?' এই বলে তিনি ব্রাহ্মণীর পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে অনেক খাদ্যসামগ্রী দিলেন এবং সোনার বালা উপহার দিয়ে বিবিধ অলংকার ও ধনসামগ্রী দান করলেন। অবশেষে রত্নাবতী তাঁদের পালকিতে চড়িয়ে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করলেন এবং ধান ও টাকা সঙ্গে দিয়ে বিদায় জানালেন।

রাজা ও তাঁর অমাত্য বললেন, 'বণিকপত্নী, আপনি পাঁচ টাকার জন্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে বাড়ীতে এনে এত ধনসম্পদ খরচ করলেন কেন?'

বণিকপত্নী উত্তরে বললেন, 'যদি ধার টাকার জন্য ব্রাহ্মণকে আটক রাখতাম তাহলে উনি ঋণী থাকতেন। তাই দান হিসাবে আমি তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিলাম।'

একথা শুনে সকলে বণিকপত্নীকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। পরদিন সকাল সাত ঘটিকা। সেই সময় চিলের পায়ে লগ্ন একটি সোনার আংটি বণিকের বাড়ীর উঠানে এসে পড়ল। বণিক-পত্নী সেই আংটি দিয়ে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণকে পূজা করলেন। সব লোকজন বণিকের বাড়ী থেকে ফিরে গেলেন। তারপর বণিক-পত্নী চাকর-বাকরদের ডেকে বললেন, 'তোমরা নিজের নিজের ঘরে যাও।' এই আদেশ করে তিনি কাউকে একশ টাকা, কাউকে পঞ্চাশ টাকা, কাউকে পঁচিশ টাকা বখশিস দিয়ে বিদায় দিলেন। অতঃপর তিনি স্বামীর অঙ্গুলি লক্ষ্য করে আগুনে আত্মবিসর্জন করলেন।

ঐ বণিকপত্নীর পরিচারকদের মধ্যে আমি অন্যতম। পঁচিশ টাকা বখশিস পেয়ে আমি স্বদেশ অভিমুখে পা বাড়ালাম। পথে এক বেশ্যা আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?'

আমি বললাম, 'আমি একজন গোয়ালা, নাম সুধাকর।' অতঃপর তার কাছে সমস্ত কাহিনী খুলে বললাম।

তখন সে মধুর ভাষায় আমাকে বলল, 'ওহে সুদর্শন পুরুষ, তুমি আমাকে সঙ্গ দাও।'

আমি বললাম, 'তাহলে লোকে আমায় নিন্দা করবে।' সে জানাল, 'আমিও তো গোয়ালার বেটি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাতে কি হয়?'

সে বলল, 'আমি দাসীর মতো তোমার সেবা করব। তুমি আমার সাহচর্যে খুব আনন্দ পাবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি লোকে প্রশ্ন করে এই স্ত্রীলোকটি আপনার কে, তখন আমি কি বলব?'

সে বলল, 'তাহলে আমি নিজে জানাব যে উনি আমার স্বামী।'

এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাল। আমি তার সঙ্গে কয়েক দিন খুব আনন্দে কাটালাম; আমার সমস্ত ধনসম্পদ সেই বেশ্যার হাতে সমর্পণ করলাম। তারপর এক রাত্রিতে সেই বেশ্যা আমাকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আবার যদি আমার বাড়ীতে ঢোক তবে লাথি মেরে তাড়াব।'

আমি তখন নিজের কথা ভাবতে ভাবতে গ্রামের বাইরে এক গাছতলায় আশ্রয় নিলাম আর ভাবলাম, 'নির্ধন মানুষের এমন তিরস্কার ভোগ করা উপযুক্তই বটে। কারণ— ব্রহ্মহত্যাকারী মানুষও লোকের কাছে পূজ্য হয়, যদি তার বিপুল

ধনসম্পদ থাকে। কিন্তু চন্দ্রবংশের ন্যায় উচ্চকুলে জন্ম নিলেও নির্ধন ব্যক্তি সকলের দ্বারা তিরস্কৃত হয়।' আমি যখন এরূপ চিন্তা করছি, তখন ক্ষান্তিশীল নামে এক খড়্গহস্ত কাপালিক উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে, গাছতলায় কে বসে আছে ?

• আমি উত্তর দিলাম, 'আমি এক গরিব মানুষ।'

কাপালিক বললেন, 'ওঠ, আমার কাছ থেকে এই আভরণ ও মণি গ্রহণ কর। আমি বেতালসাধনা সিদ্ধ করব, তুমিও এই অক্ষর জপ কর। এই শাক ও তণ্ডুল গ্রহণ করে আমার সঙ্গে এস।'

কাপালিকের কাছে মণিমাণিক্য লাভ করে আমি হাসিমুখে তার সঙ্গে ঘর্ঘরা নদীর তীরে পৌঁছালাম। কাপালিক পূজার ফুল জোগাড় করে সেই ফুলের মধ্যে খড়্গ লুকিয়ে রেখে আমাকে বললেন, 'তুমি একটু দূরে অপেক্ষা কর।'

তার কথামত আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্যদিকে রাজা বিক্রমকেশরী সন্ন্যাসীর কথা অনুসারে শিমুল গাছে অবস্থিত শবদেহ আনতে গিয়েছেন, কারণ বেতালসিদ্ধি তখনও অসম্পূর্ণ। একমাত্র মৌনী ব্যক্তিই সেই শব আনয়নে সমর্থ; মৌন ভঙ্গ করলে শবদেহ পুনরায় ঐ গাছে ফিরে যায়। তাই রাজার মৌনভঙ্গের জন্যে ঐ শব তাকে পঁচিশটি কাহিনী শুনিয়ে প্রত্যেকটি কাহিনীর শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল এবং রাজাও সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। শেষ কাহিনী শোনাতে গিয়ে শবদেহ রাজাকে বলল—'হে মহারাজাধিরাজ, দীর্ঘচরণা ও ক্ষুদ্রচরণা নামে দুই অপ্সরাভগিনী ফুল আহরণের জন্য বনে গিয়েছিল। সেই সময় এক রাজা ও রাজপুত্র ঐ বনে মৃগয়া করতে গেলেন। অপ্সরাভগিনীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হোল। রাজা দীর্ঘচরণাকে বিবাহ করলেন এবং তার পুত্র ক্ষুদ্রচরণাকে বিবাহ করলেন। তারপর তারা সকলে রাজ্যে ফিরলেন। কাল-

ক্রমে দীর্ঘচরণার পুত্র জন্মাল; নাম রাখা হোল দীর্ঘচরণ, এবং ক্ষুদ্রচরণারও পুত্র জন্মাল, নাম রাখা হোল ক্ষুদ্রচরণ। তাহলে ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে তা বলুন। মহারাজ, যদি এই প্রশ্নের উত্তর জেনেও না বলেন তবে মহাপাতকী হবেন; আর যদি উত্তর না জানেন তবে চুপ করে থাকুন।'

রাজা সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও ঐ প্রশ্নের উত্তরবিষয়ে সন্দিহান হয়ে মৌনী রইলেন। তারপর বেতাল রাজার মনোভাব অনুভব করে বলল, 'মহারাজ, যার কাছে আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন, তিনি একজন কাপালিক। সেই পাপী দুরাত্মা আমাকে হত্যা করেছে এবং আপনাকেও হত্যা করবে। তারপর সে বেতাল সাধনায় সাফল্য অর্জন করবে। তাই আমরা উভয়েই এখন কাপালিকের সেবক হবো। আপনি আমাকে বহন করে নিয়ে চলুন, পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু আপনি মহাশয় ব্যক্তি, তাই আপনাকে হিতবাক্য শোনাই—কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে আপনি শ্মশানে এসেছেন। কাপালিক আমাকে হত্যা করার পর দেবী চণ্ডিকার পূজা সেরে আপনাকে বলবেন, 'মহারাজ, সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করুন।' আপনি কাপালিককে বলবেন, 'আমি রাজচক্রবর্তী রাজা, প্রণাম করতে শিখিনি; সকলে আমাকেই প্রণাম করে। আপনি প্রথমে আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনার প্রণাম দেখে আমি সেইমত প্রণাম করব।' তারপর কাপালিক যখন দেবীকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন, তখন আপনি সেই পুষ্পাচ্ছাদিত খড়্গ তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করবেন। তারপর আমি বরং সেই কাপালিকের দেহ ও আপনাকে বহন করব। কিন্তু সেই কাপালিকের দাসত্ব করব কেন?'

বেতালের কথা শুনে রাজা শব বহন করে কাপালিকের হাতে অর্পণ করলেন। কাপালিক রাজার প্রশংসা করতে করতে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ধন্য; বিজয়ী হোন। স্বয়ং রাজা হয়েও

চতুর্দশীর এই অন্ধকারে আমার কথামত একাকী শ্মশানে এসেছেন। এখন শবদেহ নামিয়ে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মনোবাসনা সফল করুন।'

রাজা বললেন, 'হে মহাসত্ত্ব, আমাকে সকলে প্রণাম করে, কিন্তু আমি কখনো কাউকে প্রণাম করি না। তাই আপনি প্রথম দেবীকে প্রণাম করুন। তা দেখে পরে আমি প্রণাম করব।'

তারপর কাপালিক চণ্ডিকাকে পূজা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। রাজা সত্বর খড়্গ তুলে নিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। চতুর্দিকে জয়শব্দ উঠল। আমি দূর থেকে সেই ঘটনা দেখে ছুটে পালিয়ে গেলাম; দৌড়াতে দৌড়াতে এই মণ্ডপে পৌঁছে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে শুরু করলাম। হে মহাত্মা, হে মহারাজ, হে সভাসদ্‌গণ, আপনারা আমার নিন্দা করবেন না, প্রশংসা করুন। কারণ আমি যা জানি তাই নিবেদন করলাম।"

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে গৌড়বিজয় রাজ্যে সেকের আগমন বর্ণনায় যোগীর কাহিনী সমাপ্ত।

এগার

রাজার বংশচরিত

সেই যোগীর সমস্ত কাহিনী শুনে সেক রাজাকে অনুরোধ করলেন, 'এবার আপনার কাহিনী শোনান।'

সেকের ভয়ে লজ্জিত রাজা বলতে শুরু করলেন, "আমার কাহিনী শুনুন—আমার পিতামহ ছিলেন বিজয়সেন। তিনি ছিলেন খুবই গরিব এবং শিবের ভক্ত। জীবিকা নির্বাহের জন্য

তিনি প্রতিদিন শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং সপ্তবুটিকা কপর্দক লাভ করতেন। গৃহিণীর ভয়ে সেই সাত কপর্দকের মধ্যে পাঁচটি কপর্দক চুরি করে তিনি শিবের পূজা করতেন। একবার আশ্বিন মাসের সময় কোন একদিন অতি-বৃষ্টির ফলে কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। পিতামহ সেদিন তাঁর কুঠার বন্ধক রেখে তার বিনিময়ে সাত কড়ি সংগ্রহ করে গৃহিণীর হাতে জমা দিলেন। পরদিন তিনি যার বাড়ীতে কুঠার বন্ধক রেখেছিলেন তার বাড়ীতে গেলেন। তিনি তার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি বন্ধকী কুঠার কিছুতেই ফিরিয়ে দিলেন না।

পিতামহ ধীরগতিতে বাড়ীর অভিমুখে রওনা দিলেন আর ভাবতে লাগলেন, 'বাড়ীতে পা দিলেই গৃহিণী তিরস্কার করতে শুরু করবে। তাহলে এই মাঠে বেলগাছের তলায় আশ্রয় নিই। শিবের অর্চনা এখনো সারা হয় নি।' এরূপ চিন্তা করে তিনি এক বেলগাছের তলায় অবস্থান করলেন। রাত্রিতে শিবকে স্মরণ করতে করতে তিনি সেখানেই শয়ন করলেন। মহাদেব ভাবলেন, 'এই বেচারা এখানে শুয়ে থাকলে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।' সেই চিন্তা করে ছদ্মবেশে সেখানে আবির্ভূত হয়ে তিনি বললেন, 'ওহে হতভাগ্য, এখানে কি করছ?'

হতভাগ্য পিতামহ বললেন, 'সে কথায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি ভেবেছিলে যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি; কিন্তু আমি ঘুমোই নি, জেগেই ছিলাম। তুমি আমার কাপড়চোপড় চুরি করতে এসেছ? দেখতে পাচ্ছ না আমার হাতে লাঠি, এখন পালাও।'

ছদ্মবেশী শিব পুনরায় তাঁকে বললেন, 'এখানে থাকলে বাঘের মুখে পড়বে। সত্বর পালাও, নতুবা অনেক দুর্গতি।'

তিনি বললেন, দুর্গতি 'আমার নয়, তোমার! আমার বাড়ীতে

স্ত্রীপুত্রাদি আছে, ধানভানার পাথর রয়েছে, মাটির কলসীতে চাল আছে। তাহলে আমি দুর্ভাগা হব কেন?' তিনি আরও বললেন, 'আমি এক ব্যক্তির কাছে আমার কুঠার বন্ধক রেখেছিলাম। তিনি কুঠার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। যদি তোমার কথামত বাড়ী ফিরে যাই, তাহলে গৃহিণী খুব তর্জন-গর্জন করবেন, কারণ তিনি অতি মুখরা। তাছাড়া তিনি আমার উপাস্য দেবতা শিবের নামে কুকথা বলবেন। তাই ঠিক করেছি বাড়ী ফিরব না। তুমি আমার বাড়ীর কথা তো জান না।'

এই সময় রাজা রামপাল অনশনে আত্মবিসর্জন দেওয়ার মানসে গঙ্গাতীরে পৌঁচেছেন। ক্রন্দনরত আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'ওহে পুরবাসীরা, তোমরা আমার কথা ঠিকমত পালন করবে। ভগবান শিবের অনুগ্রহে আমরা বাহান্ন পুরুষ রাজত্ব করেছি। কিন্তু এখন আমি পুত্রহীন, তাই এ-জীবন রাখতে চাই না; তোমরাই আমার পুত্রের মতো, তোমাদের জন্যেই আমি নিজপুত্রকে শূলে চড়িয়েছি। তাই তোমরা অবশ্যই আমার শ্রাদ্ধ করবে। আমার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হবেন আমি তার দাসানুদাস। সেই রাজা আমার যশ লঙ্ঘন করবেন না এবং ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, আতুর, অন্ধ প্রভৃতিকে রাজার প্রদত্ত বৃত্তি থেকে কখনো বঞ্চিত করবেন না। যে রাজা আতুর ব্রাহ্মণ এবং আমার সকল পরিচারক-পরিচারিকাদের পালন করবেন, তিনি চিরবিজয়ী হবেন।' এসব কথা বলে রাজা রামপাল মৌনী হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আগত পুরবাসীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে লগেলেন। তারা বিলাপ করে বলতে লাগলেন, 'হায়! আজ আমাদের মহারাজ মৃত্যু বরণ করবেন।' পত্নীর সঙ্গে রাজা রামপাল গঙ্গার জলে অবস্থান করলেন।

রাত্রিতে মহাদেব পুনরায় আবির্ভূত হয়ে পিতামহকে বললেন, 'ওহে দুর্গত, এই দেখ তোমার কুঠার। আগামী কাল গঙ্গাতীরে

হাজির হয়ে এই কুঠার গ্রহণ করবে। ওহে হতভাগ্য, প্রাতঃ কালেই গঙ্গাতীরে পৌঁছাবে, সেখানেই আমি তোমাকে কুঠার ফিরিয়ে দেব।'

নিজের কুঠার দেখতে পেয়ে আমার পিতামহ হাসিমুখে মহাদেবকে বললেন, 'তুমি অমুক লোকের বাড়ীতে আমার এই কুঠারটি পেয়েছ।'

মহাদেব বললেন, 'যেখানেই পাই না কেন, গঙ্গাতীরে যেখানে মহান রাজা রামপাল সস্ত্রীক জলের মধ্যে অবস্থান করছেন, সেখানেই হাজির হবে; তাহলেই তোমার কুঠার ফিরে পাবে।' একথা জানিয়ে শিব প্রস্থান করলেন।

সেই রাত্রিতেই রাজ্যে ফিরে গিয়ে মহাদেব রাজমন্ত্রী সহদেব ঘোষকে স্বপ্নে বললেন, 'সহদেব ঘোষ, আগামী কাল সকাল সাত ঘটিকায় রাজা রামপাল মৃত্যু বরণ করবেন, তাঁর মৃত্যুর পর বিজয় সেন নামক এক লগুড়ধারী দরিদ্র ব্যক্তি সেখানে হাজির হবে। তাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করে রাজা করবে।' একথা জানিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

রাত্রি প্রভাত হল। বিজয় সেন লগুড়হাতে গঙ্গাতীরে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। ৮৮৯ (৯৮৮ ?) শকাব্দে সূর্য যখন কন্যা রাশীতে বর্তমান (অর্থাৎ আশ্বিন মাসে) কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে দিনের দ্বিতীয় যামে পালবংশের চূড়ামণি রামপাল উপবাসী অবস্থায় বিষ্ণুর শ্রীচরণ স্মরণ করে গঙ্গার জলে দেহ-ত্যাগ করলেন।

সেই সময় মন্ত্রী সহদেব ঘোষ দেখলেন এক ব্যক্তি লগুড়-হাতে সেখানে হাজির হয়েছেন। মন্ত্রী সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'ঐ লগুড়ধারী ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এস। সৈন্যরা পিতামহকে ধরে টানতে টানতে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি মন্ত্রীর অনুচরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

সে উত্তর দিল, 'তুমি তো জান না যে রাজা রামপাল সুস্থ আছেন; তাঁর কল্যাণের জন্য মন্ত্রী নরবলির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বলিদানের যোগ্য কোন মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না; তুমি অনাথ ও গরীব, তাই বলিদানের যোগ্য ব্যক্তিরূপে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

সেবকের কথা শুনে পিতামহ অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তো বলিদানের যোগ্য অনাথ ব্যক্তি নই। আমার স্ত্রী-পুত্র আছে।'

মন্ত্রী বললেন, 'ওকে শীঘ্র নিয়ে এস।'

পিতামহ কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

মন্ত্রীর অনুচর বলল, 'ওকে স্নান করাও।'

পিতামহ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে স্নান করাচ্ছেন কেন?'

অনুচর পুনরায় বলল, 'ওকে চন্দন মাখাও।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে চন্দন মাখাচ্ছেন কেন?'

অনুচর বলল, 'ওহে মূঢ়, তুমি কি জান না যে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয়, তাকে পূর্বে স্নান করান ও চন্দন মাখান হয়।'

পিতামহ বললেন, 'আমাকে মারবেন না।'

মন্ত্রী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'ওহে মন্ত্রী, আমাকে বলি দেওয়ার জন্য এখানে আনলেন কেন?'

তখন মন্ত্রী হা হা করে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, 'না না, ভয় পাবেন না; স্থির হোন। বস্ত্র-অলংকার পরুন।' মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কি?'

পিতামহ উত্তর দিলেন, 'আমার নাম বিজয় সেন।'

তারপর মন্ত্রী স্বয়ং তাঁকে বস্ত্র-অলংকারে সাজিয়ে সেবকদের বললেন, 'ওহে তোমরা শোন, রাত্রিবেলা ভগবান শঙ্কর আমাকে

বলেছেন—হে মন্ত্রী, বিজয় সেন নামে এক ব্যক্তি লগুড়হাতে প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে পৌঁছাবেন; তাকে রাজা করবে। এখন যদি মহাদেবের আদেশ মানতে চাও, তাহলে একে রাজা কর।'

তারপর সকলে মিলে শিবের কথা মান্য করে পিতামহ বিজয় সেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তারা ভাবলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয় উচ্চবংশে জাত। পিতামহ বিজয় সেন রাজা হয়ে মৃত রাজা রামপালের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করালেন।

একদিন অমাত্যগণ সকলে হাজির হয়ে রাজা বিজয় সেনকে জানালেন, 'মহারাজ, আপনি আমাদের আদেশ করুন আমরা আপনার জন্য কী করব এবং অন্যদের দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ করাব।'

রাজা বিজয় সেন তাদের বললেন, 'ওহে অমাত্যগণ, আমি আমার বন্ধকদেওয়া কুঠারটি এখনও ফিরে পাইনি।'

রাজার মুখে একথা শুনে সমস্ত মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী সহদেব ঘোষকে মারতে উদ্যত হলেন। সহদেব ঘোষ ভয়ে রাজসভা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে তিনি অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, 'সাক্ষাৎ মহাদেবের কথামত একে রাজা করলাম; তাহলে শিবও কি পাগল হয়েছিলেন। নতুবা তিনি কি একজন কাঠুরিয়াকে রাজা করতে চাইতেন! আমি নিজেও পাগল, আর সেই রাজা বিজয়সেন মহামূর্খ। রাজত্ব লাভ করে তিনি মন্ত্রীদের কাছ থেকে বন্ধকদেওয়া কুঠার ফেরে চাইলেন? তাহলে আমরা তিনজনই পাগল।' এরূপ চিন্তা করতে করতে মন্ত্রী রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রিকালে মহাদেব মন্ত্রীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় বললেন, 'হে মন্ত্রী, ভীত হয়ো না; বারো বছরে দারিদ্র্যজ্বালা দূর হয়ে যায়। আগামী দিন কয়েকের মধ্যে তোমাদের রাজা ভদ্র, হয়ে উঠবেন।'

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে পুনরায় একত্র মিলিত হলেন। তারা সকলে মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে শুভ সংবাদ জানালেন। পরদিন রাত্রিতে মহাদেব স্বয়ং আর্বিভূত হয়ে আমার পিতামহ বিজয়-সেনকে বললেন, 'হে মহারাজ, ভয় পাবেন না; স্থির হোন। আপনারা সাত পুরুষ রাজত্ব করবেন। বল প্রয়োগের দ্বারা কেউ কিছু করতে পারবে না। অধিকন্তু আমি আপনাকে শব্দ-ভেদী বিদ্যা দান করছি। আপনি নিজের পুত্রকে এই বিদ্যা দান করবেন। তিনি আবার কালানুক্রমে তাঁর পুত্রকে দান করবেন। এভাবে আপনারা সাত পুরুষ অপরাজেয় হয়ে রাজত্ব করবেন।'

রাজার কাহিনী এখানেই শেষ।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে গৌড়-বিজয়রাজ্যে সেকের আগমন কাহিনী সমাপ্ত।

বার

তীরন্দাজ মদন

পরদিন প্রাতকালে সকলে সেকের মোকামে আগমন করলেন সেক রাজাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আপনি কেন আমার এবং সেই সন্ন্যাসীর সেবা করছেন? কলিযুগে আপনার ন্যায় সাক্ষাৎ ভগবানের তুল্য এমন রাজা আর কে আছেন? ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট রাজাও হার মানবে। এভাবে আমাকে সেবা করলে লোকে আপনার অবমাননা করবে, ফলে আপনার অমঙ্গল হবে। আমরা হলেম পশ্চিমা, তাই লোকে আমাদের ভয় পায়।

আপনি গঙ্গাতীরে গিয়ে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখান। তখন সকলে জানবে আপনি একজন কতবড় তীরন্দাজ।'

সেকথা শুনে রাজা ধনুহাতে সসৈন্যে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেই সময় এক শুঁড়িবউ কলসী নিয়ে সেই পথ দিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল। তার কানে ছিল তালপাতার দুল। রাজা তাকে দেখেই শর তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তার দিকে নিক্ষেপ করলেন; শুঁড়িবউ দেখতে না দেখতেই সেই শর তার কানের দুলের ভিতর দিয়ে বিদ্ধ হোল। উপস্থিত লোকজন সকলে বারবার বলতে লাগল, 'ধন্য এই রাজা!' তারা রাজার নৈপুণ্যের কথা একটি আর্যায় প্রকাশ করল—

পাণ্ডুদেশের মঙ্গল,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন মহাবীর
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।

রাজসৈন্যরা রাজার প্রশংসায় আত্মহারা হলেন। সৈন্যদের মধ্যে মদন নামক একজন পদাতিক এসে বলল--

রাজা শ্রীলক্ষ্মণসেন কি বড় বীর?
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর।

মদন বারবার সেই কথাই বলতে লাগল। কিন্তু লোকজন তাকে নিষেধ করে বলল, 'ওহে মুর্খ, এসব কথা বলছ কেন? যদি মরতে চাও, তাহলে এমন কথা বল, নতুবা নয়।'

তাদের কানাকানি রাজা শুনতে পেলেন। তিনি মদনকে ডাক দিলেন, 'ওরে পাপিষ্ঠ, এদিকে আয়!' মদন রাজার কাছে হাজির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কার সঙ্গে আছ?'

মদন উত্তর দিল, 'আমি হলেম মন্ত্রী উমাপতিধরের পদাতিক।'

রাজা উমাপতিধরকে আনতে লোক পাঠালেন। সেবকরা মন্ত্রীকে বলল, 'মন্ত্রিবর, রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে আমাদের পাঠালেন।'

মন্ত্রী উমাপতিধর বললেন, 'আমার যাবার সময় নেই।'

তাদের কথা শুনে রাজা পুনরায় আদেশ করলেন, 'ওর কোমর ধরে সত্বর নিয়ে এস।' এই আদেশ করে তিনি সেককে বললেন, 'আপনি এখন এই মন্ত্রীর পক্ষে কিছু বলবেন না।'

রাজার লোকজন মন্ত্রীকে কোমরে ধরে সেখানে হাজির করল। রাজা বললেন, 'এই মন্ত্রী একজন দুরাত্মা, আমার নামে অপবাদ রটিয়ে বেড়ায়। আমি তা শুনেও শুনতাম না। কিন্তু এখন নিজ কানে শুনছি—তার একজন অনুচর আমার নামে নিন্দা রটাচ্ছে। এই মন্ত্রীও আমার অপবাদ রটায়। এর শিরশ্ছেদ কর্তব্য। যে আমার নামে নিন্দা রটাবে, সেই আমাদের চোখে মন্দ হবে। কারণ পোড়া ভাত, নড়ে যাওয়া দাঁত এবং দুষ্ট মন্ত্রী—এই তিনটি সমূলে পরিত্যাগ করতে হয়।' তারপর ক্রুদ্ধ রাজা অনুচরকে আদেশ দিলেন, 'এই মন্ত্রীকে বাইরে নিয়ে যাও এবং তারপর শিরশ্ছেদ কর।'

মন্ত্রী অবনতমস্তকে রইলেন। সেক তাকে বললেন, 'কেন এমন হল?' মন্ত্রী বললেন, 'যার যেমন ভাগ্য।'

সেক বললেন,

রাম রাজা বর্তমান, ইন্দ্র বর্ষে জল,
যে বৃক্ষ রোয়া হৈল, সে অবশ্য ধরে ফল।

মন্ত্রী জবাব দিলেন,

যে বৃক্ষ রোয়া হয়, তার অবশ্য করিবে আশ,
যদি বা শীঘ্র ফলে, তবে তো হয় ছয় মাস।

তারপর সেক রাজাকে বললেন, 'বহু ক্লেশে একটি শিলাকে পর্বতে স্থাপন করা যায়; কিন্তু সেই শিলাটি অনায়াসে পাহাড় থেকে নীচে নিক্ষেপ করা যায়। গুণ-দোষের পার্থক্যও ঠিক তেমন। আপনি একজনের ব্যবহার লক্ষ্য করে তার অপবাদের জন্য অন্যকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন কেন?'

রাজা সেককে বললেন, 'আমি আপনাকে পূর্বে নিষেধ করেছিলাম। আপনি নিজেও এর দুর্ব্যবহারের কথা জানেন; এই মন্ত্রী আপনাকে বিষ ভক্ষণ করিয়েছিল।'

সেক বললেন, 'তাতে আমার কি হল। মহারাজ শুনুন, আপনার মঙ্গলও এই মন্ত্রীর সঙ্গে জড়িত। ভৃত্যের অপরাধে প্রভুর দণ্ডবিধানের যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা তখনই কার্যকরী হয় যখন ভৃত্য বর্তমান থাকে না।'

একথা শুনে রাজা মন্ত্রীর সেবককে হাজির করাতে আদেশ দিলেন। সেবক হাজির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পরিচয় কি?' লোকটি পূর্বের মতই বলল, 'আমি রাজার একজন পদাতিক সৈন্য, নাম মদন; রাজার আদেশে মন্ত্রী উমাপতি ধরের নিকটে ছিলাম।'

সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজার সম্পর্কে তুমি কি অপবাদ দিয়েছ?'

মদন পূর্বকথার পুনরুক্তি করে বলল, 'আমি রাজার পদাতিক সৈন্য।'

সেক—তোমার বেতন কত?

মদন—প্রতিদিন ছ' কপর্দক।

সেক—তোমার গুণের পরিচয় দাও।

মদন—আমি ধনুর্বিদ।

সেক—আমরা তোমার ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা করব।

মদন—এখানে রাজার বেতনভোগী অনেক ধনুর্বিদ রয়েছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে আমার গুণের পরিচয় নিতে চান কেন? আমি অল্প বেতনের চাকুরে। আগে তাঁদের পরীক্ষা হোক, তারপর আমার গুণ বিচার করবেন।

সেক—কঠিন কঠিন কাজে তাদের গুণের পরীক্ষা হয়। এখন আমরা শুধু তোমার গুণ পরীক্ষা করতে চাই।

নিষ্ঠাবান মদন উত্তর দিল, 'চারহাত পরিমাণ পাটখণ্ড আনুন এবং সেটি গঙ্গার জলের ভিতর রাখুন। তারপর আমাকে দু'শ দু'খানা তীর দিন।'

তার কথামত রাজা সব ব্যবস্থা করলেন। তীরগুলি পেয়ে মদন একটি একটি করে তীর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করল। সব তীর নিক্ষেপের পর গঙ্গার জলের ভিতরে স্থাপন করা সেই পাটখণ্ড তুলে এনে সকলে দেখলেন তীরবিদ্ধ পাটখণ্ড একটি সুন্দর ময়ূরে পরিণত হয়েছে। ময়ূরের পা, ডানা, লেজ, সবই সুন্দরভাবে তৈরি। সকলে বলতে লাগল, 'এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! পদাতিক মদন ধন্য!' এভাবে তারা সকলে উঁচুনীচু গলায় প্রশংসার কথা বলতে লাগল।

সেক সকলকে চুপ করিয়ে মদনকে বললেন, 'তোমার গুণ অনন্ত; এবার অন্য কোন গুণের পরিচয় দাও।'

মদন বলল, 'আমার সামনে সাতটি হাতি রাখুন এবং হস্তিবাহিনী অস্ত্রহাতে অবস্থান করুক। তারপর তারা সকলে যথাশক্তি আমার পিছনে এবং সামনে আক্রমণ করুন। আমি একা শুধুমাত্র চুনমাখা একখানি লগুড় হাতে নিয়ে তার দ্বারা সকলকে সংহার করব। দুই দলেই জানবে কে কাকে হত্যা করতে পারে। যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে রাজার বুকের ব্যথা দূর হবে।'

সমস্ত ব্যবস্থা সারা হল। মদন লগুড়হাতে সকলকে তাড়া করল। লগুড়ের আঘাতে হস্তিবাহিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল; তাদের চিহ্নমাত্র রইল না। ঘটনা দেখে সকলে তার প্রশংসা করে বললেন, 'ধন্য মদন!'

সেক বললেন, 'তোমার অনেক গুণ। অন্য কোন গুণের পরিচয় দাও।'

মদন বললেন, 'তথাস্তু। ছাদের উপর কিছু বিড়াল রাখুন— বাঁদিকে চারটি, ডানদিকে চারটি এবং পিছনে তিনটি। তারপর

আমি জোড়পায়ে দাঁড়িয়ে একটি তীরের দ্বারাই সবগুলি ভেদ করব।

অতঃপর তার সেই নৈপুণ্য দেখে সকলে বলে উঠল, 'ধন্য এই পদাতিক মদন। এমন লোক রাজ্য পাবার যোগ্য।'

রাজা মনে মনে কিঞ্চিৎ ভীত হলেন, কিন্তু কোন কথা না বলে চুপচাপ রইলেন। সেক রাজাকে বললেন, 'আমি থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। ভীত হবেন না, মন স্থির করুন। মদনের উপর প্রসন্ন হোন।'

রাজা বললেন, 'তাহলে একে কিছু টাকা পুরস্কার দেওয়া উচিত।' সেক মদনকে এক মুদ্রা দান করলেন এবং নিজের হাতে একটি চাঁপা ফুল উপহার দিলেন। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা-বাবা আছেন তো?'

মদন বলল, 'মা বাবা কেউ নেই।'

সেক বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। এদেশে আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তুমি আমার কাছেই থাকবে।'

রাজা সেককে বললেন, 'আমি জনগণকে ঠিকমত বুঝতে পারি না; কে আপন, কে পর তা নির্ণয় করতে পারি না।'

অবশেষে সেক মন্ত্রী উমাপতি ধরকে বস্ত্রাদি উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন। রাজাও তাকে পুরস্কৃত করলেন। মন্ত্রী অর্ধেক সৈন্য সঙ্গে করে ঘরে ফিরলেন। রাজাও নিজ প্রাসাদে ফিরে চললেন।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মদনের উপাখ্যান সমাপ্ত।

তের

বিদ্যুৎপ্রভার গান

সমস্ত লোকজন উদ্বিগ্নভাবে পৃথক পৃথক আলোচনা করে বলাবলি করতে লাগলেন, 'আগামী দিনে কি হবে কে জানে। কে রাজা হবেন তাই বা কে জানে? ভাগ্যবলে সেক মদনকে নিবৃত্ত করলেন। মদন যেখানে সহায় হয়ে আছেন সেখানে সেক কি নিজেই রাজা হবেন না। কে রাজা হবেন—স্বয়ং সেক? নাকি সেই যোগী? অথবা মদন? প্রজারা সর্বদা এসব বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। উদ্বিগ্ন রাজা ঘরে ফিরলেন। কিন্তু মন্ত্রী যেন ক্রোধবশে মূর্ছিত। তবে প্রজারাও ধর্মভয়ে মন্ত্রীকে পীড়া দিতে পারলেন না।

'জগতের মঙ্গল হোক'—একথা বলে সেকও বিদায় নিলেন।

অতঃপর একদিন মন্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে রাজা গঙ্গাতীরে এসেছেন। সেক বললেন, 'আমি যতক্ষণ এখানে আছি, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আল্লার অনুগ্রহে আপনি সাত পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করবেন। এই রাজ্য অন্য কেউ করায়ত্ত করতে পারবে না, আপনারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বিদ্যুৎপ্রভা নামে এক নর্তকী আছে; আমি পূর্বে তাকে দেখেছি। তাকে এখানে আনুন। বিদ্যুৎপ্রভা নাচবে, প্রজারা নাচ দেখবে।

একথা শুনে রাজা আদেশ দিলেন, 'শশিকলার সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রভাকে আনয়নের ব্যবস্থা কর।'

বিদ্যুৎপ্রভা উপস্থিত হলে রাজা বললেন, 'বিদ্যুৎপ্রভা শোন, তুমি গান শুরু কর। গান শুনে জানব যে সঙ্গীতে তোমার দক্ষতা আছে কি নেই।'

বিদ্যুৎপ্রভা সেককে প্রণাম করে রাজাকে বললেন, 'আমি সুহৈ রাগে গান ধরছি।'

সঙ্গীত শুরু হল। সেই সময় এক বণিগ্‌বধূ কাছাকাছি কোন কুয়ো থেকে জল তুলছিলেন। গান শুনে তার পরাণ উধাও। তিনি ভুলের বশে জলের কলসীর বদলে নিজের পুত্রের গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োর জলে বারবার নামাতে-ওঠাতে লাগলেন। এর ফলে তার পুত্রের তখন মুমূর্ষু দশা। লোকজন বণিগ্‌বধূর এই কাণ্ড দেখে উচ্চকণ্ঠে কোলাহল করে উঠল। সেক তাদের কোলাহল শুনতে পেলেন। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, ভীষণ কোলাহল শোনা যাচ্ছে।'

রাজা লোক-মারফৎ সেই কোলাহলের ব্যাপারে খবর নিয়ে সেককে তার সংবাদ জানালেন। সেক মনে মনে ভাবলেন, 'দোষ আমারই। তাহলে বণিগ্‌বধূ ও তার পুত্রকে এখানে ডেকে পাঠাই।'

বণিগ্‌বধূ পুত্রসহ সেখানে হাজির হলে রাজা বললেন, 'পাপীয়সী, তুমি কি নিজের চোখেও দেখনি, লোকজনের কথা কানেও শোননি? ছেলের গলায় জল-তোলার দড়ি বেঁধে কুয়োতে ডুবিয়ে মারলে! এই অপরাধের জন্য তোমাকে হত্যা করা উচিত।' এই বলে রাজা আদেশ দিলেন, 'এর কর্ণ-নাসিকা ছেদন করে রাজ্য থেকে নির্বাসিত কর।'

রাজার লোকজন তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে সেক তাদের বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' তারপর তিনি বণিগ্‌বধূকে বললেন, 'হতভাগিনী নারী, ছেলের গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োর জলে ডোবালে কেন? এমন কাজ করলে কি করে? ভয় নেই, মন স্থির কর।'

বণিগ্‌বধূ বললেন, 'আমি তখন সুহৈ রাগে গাওয়া উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনে এমন মাতোয়ারা যে নিজের অজ্ঞাতেই দড়ি থেকে

জলের কলসী খুলে ছেলের গলায় বেঁধে তাকে কলসী ভেবে কুয়োতে নামিয়েছিলাম। এইমাত্র ব্যাপার।'

তার কথা শুনে সেক মনে মনে ভাবলেন, 'এই পাপীয়সী পুত্রশোকেই মরবে। কিন্তু লোকে জানবে আমার জন্যই তার মৃত্যু হোল। তবে অপ্সরা বিদ্যুৎপ্রভার নাচ দেখবার জন্যই তাকে আনতে রাজকর্মচারীদের আদেশ করেছিলাম; সুতরাং এ ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই।'

তারপর সেক বণিকপত্নীকে বললেন, 'আপনার ছেলের পা দুটি ধরে ঘোরান।'

বণিগ্‌বধূ তাই করলেন। তখন তার ছেলে মুখ দিয়ে জল বমি করতে লাগল। তারপর তাকে মাটিতে শোয়ান হোল। সেক বললেন, 'দেখুন, আপনার ছেলের চোখমুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।' এই বলে সেক তার আশাদণ্ড বণিকপুত্রের নাকে ছোঁয়ালেন। আশাদণ্ডের স্পর্শমাত্রই ছেলেটি মায়ের জন্য কেঁদে উঠল। তারপর সে উঠে পড়ল এবং মায়ের কোলে আশ্রয় নিল। স্ত্রী পুরুষ সকলে সেকের জয়ধ্বনি করতে লাগল।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

এই ঘটনার কিছুদিন পর বুঢ়ন মিশ্র নামক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমি একজন মহা-গায়েন ও পণ্ডিত। আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সঙ্গীতশাস্ত্রে সকলকে পরাজিত করেছি। উড়িষ্যার রাজা কপিলেশ্বর আমাকে ষড়চক্রগজ ও জয়পত্র প্রদান করেন। আমি সেখান থেকে আপনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। আপনার রাজ্যে আমার সমান গুণী যদি কেউ থাকেন, তাঁকে হাজির করুন; তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গীত অথবা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন।'

তার কথা শুনে সেক বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি গান ধরুন।'

বুঢ়ন মিশ্র পঠমঞ্জরী রাগে গান ধরলেন। সামনে ছিল এক পিঁপুল গাছ, গানের সুরে গাছের পাতাগুলি ঝরে পড়ল।

তা দেখে লোকেরা বলল, 'এ তো খুব আশ্চর্যের ব্যাপার! ধন্য ব্রাহ্মণ; এমন ব্যাপার কখনো দেখি নি, কখনো শুনি নি।'

তখন রাজা পণ্ডিত বুঢ়নকে ষড়চক্র জয়পত্র দান করতে সম্মত হলেন। জয়বাদ্য বাজতে লাগল। যখন সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত সেই সময় জয়দেব মিশ্রের ঘরণী পদ্মাবতী জয়-কোলাহল শুনলেন। তিনি ঐ পথ দিয়েই গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। কোলাহল শুনে পদ্মাবতী রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, 'সভাসদগণ, আমার কথা শুনুন। আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমান থাকতে কার এমন শক্তি যে সঙ্গীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়পত্র নিয়ে যান? আপনারা জেনে রাখুন যিনি সঙ্গীতে বা সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমাদের উভয়কে পরাজিত করতে সমর্থ, তিনিই বিজয়ী হবেন, অন্যথায় নয়। আমার স্বামীকে ডাকুন; তাঁর সঙ্গে অথবা আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক।'

তখন সেক তাকে বললেন, 'ব্রাহ্মণী, আপনি বলছেন যে আপনার স্বামী একজন মহাকবি। এখন আপনিই স্বয়ং গান শুরু করুন। তারপর আপনার স্বামীর গুণের পরীক্ষা হবে।'

জয়দেব-ঘরণী পদ্মাবতী গান্ধার রাগে গান ধরলেন। গানের সুরে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা নৌকোগুলি সেদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। উপস্থিত সভাসদ্‌গণ তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতীর প্রশংসা করে বলে উঠলেন, 'ধন্য এই ব্রাহ্মণী। এমন ঘটনা অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। ধন্য ইনি। দুই শিল্পীর মধ্যে ব্রাহ্মণীই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁর গানের সুর শুনে নির্জীব নৌকোগুলিও গতিশীল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু গাছতো সজীব পদার্থ।'

তখন সেক বুঢ়ন মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে ব্রাহ্মণ, আপনাদের দুই শিল্পীর মধ্যে কে জয়ী এবং কে পরাজিত তা সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিচারে নির্ধারিত হোক।'

বুঢ়ন বললেন, 'আমি নারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে রাজী নই। তাছাড়া দেখছি এদেশে নারীরা বিশেষ গুণবতী, কিন্তু পুরুষজাতি নির্গুণ।'

একথার পর পদ্মাবতী জয়দেব মিশ্রকে রাজসভায় আনার জন্য দাসীকে পাঠালেন। জয়দেব হাজির হয়ে সেককে বললেন, 'আমার পত্নী একে পরাজিত করেছে। আর কি বলার আছে।'

সেক তাকে বোঝালেন, 'এরা দু'জনেই বিশেষ গুণের অধিকারী। এখন আপনার গুণের পরিচয় দিন।'

তখন জয়দেব মিশ্র বললেন. 'এই ব্রাহ্মণের সঙ্গীতে গাছের পাতা ঝরে পড়েছে ; কিন্তু বসন্তে এমনিতেই পাতা ঝরার সময়। তাহলে ইনি গুণী ওস্তাদ্ হলেন কেমন করে ?'

সেক পুনরায় তাঁকে বললেন, 'মিশ্রমশায় শুনুন, বসন্তে গাছের পাতা ঝরে পড়ে একথা ঠিক, কিন্তু একদিনেই সব পাতা ঝরে পড়ে না ; দিনে দিনে এমন হয়।'

জয়দেব মিশ্র আবার বললেন, 'তা হলে উনি গান ধরুন, নিষ্পত্র বৃক্ষ সপত্র হোক।'

বুঢ়ন মিশ্র উত্তর দিলেন, 'একাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি পারেন আমাদের সাক্ষাতে তাই করুন।'

জয়দেব মিশ্র বললেন, 'যিনি পিঁপুলগাছ পুনরায় সপত্র করতে সমর্থ হবেন, তিনি হবেন বিজয়ী শিল্পী।'

বুঢ়ন বললেন, তাই হোক। কোন অন্যথা হবে না।'

সেক উভয়ের কথার প্রশংসা করে বললেন, 'আপনারা দুজনেই যথার্থ বলেছেন।'

অতঃপর জয়দেবমিশ্র বসন্তরাগে গান ধরলেন। গানের সুরে সেই পিঁপুল বৃক্ষে নবকিশলয়ের সমারোহ ঘটল। তখন চতুর্দিকে জয়দেবের নামে জয়ধ্বনি শোনা গেল। বুঢ়ন্ মিশ্র রাজার কাছে লব্ধ দ্রব্যগুলি জয়দেবকে দান করতে চাইলেন। সেকের

পরামর্শে রাজা তাঁকে নিষেধ করে আরও কিছু পুরস্কার তাঁর হাতে দিয়ে বিদায় জানালেন।

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থে জয়দেবমিশ্রের উপাখ্যান নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চোদ্দ

রজকবধূ-সমাচার

তারপর কোন একদিন রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়েছেন। গঙ্গাস্নান সমাপন করার পর তিনি সেখানে স্তোত্র পাঠ করতে করতে পূজার্চনা করছিলেন। সেই সময় এক রজকবধূ রাজ-বাড়ীর কাপড়চোপড় কাচতে ব্যস্ত ছিল। কাপড়কাচার সময় তার বুকের আঁচল খুলে পড়ছিল; সেই সুযোগে রাজা বার বার তার বুকের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রজকবধূও রাজাকে দেখে হাসিমুখে স্তনের আবরণ সরিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তুই তোর বাপের সঙ্গে বিষ্ঠা ভক্ষণ কর।' তিনি বারবার সেই কথা বলে গালমন্দ করলেন।

রাজশ্যালক চারুদত্ত সেখানে হাজির ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'রাজা আমাকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন। আমার পক্ষে এখানে থাকা ঠিক হবে না।' তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়ে ভগিনী বল্লভার কাছে অভিযোগ করে বললেন, 'দিদি, আমার বেঁচে থাকা নিষ্ফল, তোর জীবনও নিষ্ফল। গঙ্গাতীরে স্তোত্র পাঠ করতে করতে রাজা কি বলেছেন শোন— 'বাপের সঙ্গে বিষ্ঠা ভক্ষণ কর্।'

তখন রাজরানী বল্লভা রাজার কাছে গিয়ে নিজেই নিজের গালে চড় মেরে কাঁদতে লাগলেন। রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'এই তিন পাপীকে নিবৃত্ত কর।'

মন্ত্রী রাজবাক্যের অর্থ অনুধাবন করতে পারলেন না। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে তিনি রাজবচনের অর্থ উদ্ধার করলেন। রজকবধূর কাছে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী বললেন, 'গ্রামণী, ধোপানী, গণিকা এবং দূতী—এই স্ত্রীলোকদের কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা উচিত এবং এদের স্তন অনাবৃত করে রাখা উচিত।'

তার কথা শুনে ধোপানী সক্রোধে বলল, 'ওহে মূঢ় মন্ত্রী, আমার কাছে এসব কেমন কথা বলছেন? আমার স্তন দর্শন করে কার মস্তক মুণ্ডন করতে হল?' এই বলে সে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখুন মন্ত্রীমশায়, আমি তো সর্বদাই বৈদ্যের কাছে যেতে ইচ্ছুক; কিন্তু স্তনের ভার বেড়েই চলেছে; আবার মধ্যভাগ অবনত; এমন অবস্থায় সুখ কোথায়? মন্ত্রীমশায় দেখুন, স্তনভার দিনে দিনে বেড়ে উঠছে; আপনি আমাকে ওষুধ দিন, যার দ্বারা আমার স্তন পরের মনে দুঃখ না দেয়।'

চতুরা ধোপানী যখন মন্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন তখন তার স্বামী জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে মন্ত্রীমশায়, এখানে এসে কি বলছেন?'

ধোপানী স্বামীকে বলল, 'ইনি আমার স্তনের ব্যাপারে আলোচনা করছেন। রাজার ছেলে রাজা আমার স্তন দেখে মন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। এঁর হাতে রাজবাড়ীর সমস্ত কাপড়চোপড় দিয়ে দাও।'

ধোপানীর মুখে সব কথা শুনে মন্ত্রী রাজার কাছে ফিরে গিয়ে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা জানালেন। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার মনের আশঙ্কা দূর হল। তিনি চিন্তা করলেন, 'আমার পত্নীকে এই ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা উচিত; হয়ত সেই ধোপানী কাজের

অছিলায় তার কাছে হাজির হতে পারে। রাজকার্যের ব্যস্ততায় ঐ তিনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিশেষ সময় পাই না এবং তাদের সঙ্গে মধুর আলাপের সুযোগও হয় না। তারপর তিনি মন্ত্রীকে বললেন, 'বয়স, ধনসম্পদ, গৃহাপবাদ, মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, আত্ম-অপমান, অভিপ্রেত কর্ম ও দান—এই নটি বিষয় সম্বন্ধে গোপন রাখা উচিত। তাই বলি সেই ধোপানী আপনাকে কিঞ্চিৎ অপমান করেছে তা ঠিক, কিন্তু আপনি তো তাকে বেশ কড়া শাসিয়ে দিয়েছেন।'

রাজরানীর কলহ

অতঃপর একদিন যখন রাজবাড়ীতে মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা উপস্থিত রয়েছেন তখন ঐ ধোপানী রাজার কাছে হাজির হয়ে ধোলাই কাপড় জমা দিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হল। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই সেই পাপিষ্ঠা; এর কটুকথায় আমার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছিল।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা জনৈক ঘোড়সওয়ারকে আদেশ দিলেন, 'ওহে, এই ধোপানীকে ঘোড়াশালায় আটক রাখ।'

একথা শুনে ধোপানী ভাবলেন, 'রাজার বাড়ীতে যদি অপমানিতা হই, তাহলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।' এই ভেবে সে রাজপত্নীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'রানীমা, আমার সম্মান রক্ষা করুন।'

রানী মন্ত্রীকে নানারূপ কটুকথায় তিরস্কার করে বললেন, 'আপনারা রাজা ও মন্ত্রী, সবার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আপনাদের এই ব্যবহারের জন্য দুজনাকেই ধিক।'

মন্ত্রী ভয়বশত রানীর কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। তারপর রানী পাঁচ মন্ত্রীকে ডেকে তাদের সমক্ষে সমস্ত

কাহিনী জানালেন। রাজা রানীকে বারণ করে বললেন, 'ওগো, তুমি বৃথাই মন্ত্রীকে তিরস্কার করছ।'

রানী পুনরায় রাজাকে তর্জন করতে করতে বললেন, 'মহারাজ, তোমার মহত্ত্ব আমার জানা আছে। তুমি আমার ভাইকে পর্যন্ত কটুকথা বলেছ। তুমি তাকে বলেছ, 'বাপের সঙ্গে বিষ্ঠা ভক্ষণ কর্।' তুমি বড় বংশের সন্তান, রাজার পুত্র; এই তোমার ব্যবহার! তাই বলছিলাম যে তোমাকে আমি চিনি।'

রাজা হাসতে হাসতে রানীকে বললেন, 'তুমি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।'

রানী বললেন, 'তুমি আমার ভাইয়ের সাক্ষাতে একথা বলেছ; এখন অস্বীকার করছ কেন?'

তখন রাজা তাকে ধোপানীর ঘটনা বর্ণনা করে শোনালেন: 'একদিন আমি যখন গঙ্গাস্নান করে স্তোত্র পাঠ করছি, তখন এই পাপীয়সী ঘাটে কাপড় কাচার সময় বুকের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিল। আমি তার দিকে তাকালে সে আমাকে লক্ষ্য করে হাসতে লাগল। তখন আমি তাকে বললাম, 'তুই বাপের সঙ্গে বিষ্ঠা ভক্ষণ কর।' তাই আমার মন্ত্রীর কোন দোষ নেই। তুমি কেন মন্ত্রীকে তিরস্কার করছ?'

রানী বল্লভা স্বামীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি হলায়ুধমিশ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের কাছে সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা রাজা ও মন্ত্রীর আচরণ যথাযথভাবে আমার কাছে জানান।'

মন্ত্রী হলায়ুধমিশ্র ধোপানীকে সেখানে হাজির করিয়ে বললেন, 'পাপীয়সী, রাজা যখন স্তোত্র পাঠ করছিলেন, তখন তুমি বুকের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলে কেন?'

ধোপানী উত্তর দিল, 'এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমার জানা আছে, তবে ভয়ে বলতে পারি না।'

হলায়ুধমিশ্র বললেন, 'ভয় পেও না, সত্য কথা বল।'

ধোপানী পুনরায় বলল, 'আমি জানি মন্ত্রী, অমাত্য ও অন্যান্য বড় বড় লোকজন রাজার সেবা করেন। রাজা যার উপর কৃপাদৃষ্টি দেন অথবা যার দিকেই তাকান, তিনি খুব উৎসাহ পান। আমি ভেবেছিলাম—রাজা বারবার আমার স্তনের প্রতি লক্ষ্য করছেন, তাহলে আমি আজ ধন্য; তাই বারবার তাকে স্তন দেখিয়েছিলাম। স্তন ক্ষীণ হচ্ছে কি না তাই দেখছিলাম এমন নয়। আমার স্তনের প্রতি রাজার অনুরাগ দেখে ভেবেছিলাম, 'রাজা যা চাইছেন, তা করব না কেন? আপনারা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, আমার এই ঘটনা জেনে যা করা উচিত তাই করুন।'

ধোপানীর কথা শুনে হলায়ুধমিশ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যেন বোবা হয়ে গেলেন, তারা কোন কথাই বললেন না।

তারপর রানী ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কলিতে ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিও পাপে কলুষিত হয়েছে।'

তার কথায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'পাপিষ্ঠা রাজরানী, আপনার স্বামী পরস্ত্রীকামুক। আপনি রূঢ় ভাষায় আমাদের তিরস্কার করছেন কেন?'

ব্রাহ্মণেরা রাজপত্নী ও রাজাকে মারতে উদ্যত হলেন। চতুর্দিকে হাহাকার উঠল। সমস্ত ঘটনায় রাজা কিঞ্চিৎ দুর্মনা হয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা দেশ ছেড়ে যথেচ্ছ পলায়ন করতে লাগলেন। তখন রাজা সেকের কাছে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাজা ভয় পেলেন, কারণ—আশা ধৈর্যকে বিনষ্ট করে, মৃত্যু সমৃদ্ধিকে, ক্রোধ শ্রীকে এবং যশ কদর্যতাকে বিনষ্ট করে; যথাযথ পালনের অভাবই পশুদের কাছে মৃত্যুর তুল্য; কিন্তু হে রাজন, একজন ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়।'

তারপর সেক সেই ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, 'আপনারা

ব্রাহ্মণ, অথচ এমন ব্যবহার কেন। আপনারা রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন ?'

ব্রাহ্মণেরা সেককে বললেন, 'যে সভায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ উপস্থিত থাকেন না, সে সভা সভানামের যোগ্য নয় ; যে বৃদ্ধগণ ধর্মের কথা আলোচনা করেন না, তারা যথার্থ বৃদ্ধ নন ; যার মধ্যে সত্য নেই, তা যথার্থ ধর্ম নয় এবং যার মধ্যে শঠতা আছে, তা সত্য নয়।'

সেক রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আপনার অমাত্য, সুতরাং এদের হত্যা করা আপনার পক্ষে অনুচিত। ব্রাহ্মণসঙ্গীর দ্বারা বিযুক্ত সজ্জন শোভা পায় না ; ব্রাহ্মণেরা আপনার ভূষণ। দেবতা, গুরু, গোজাতি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের প্রতি ক্রোধ সর্বদা পরিহর্তব্য।'

সেকের কথা শুনে রাজা অধোমুখে রইলেন। সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, অধোমুখে রইলেন কেন ?'

রাজা উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রী মুখরা, সভাসদ ব্রাহ্মণেরা আমার উপর ক্রুদ্ধ আর অমাত্যেরা দুষ্টসহায় ; তাই আমার মনে সুখ নেই। আপনি ছাড়া আমি নিরাশ্রয়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'আয়ু, কর্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও মৃত্যু—এই পাঁচটি বিষয় মানুষের গর্ভবাসকালেই নির্ধারিত হয়।'

অতঃপর সেক ব্রাহ্মণদের বললেন, 'আপনারাই বা এই ব্যাপারে রাজার সঙ্গে আলাপ করছেন না কেন ? কারণ মহামূল্য রাজপ্রাসাদে, গোষ্ঠীতে এবং আলোচনাসভায় বিবিধ বিষয়ে বিচিত্র আলাপকারী পণ্ডিতগণই শোভা পান।'

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে রাজপত্নীর কলহ বর্ণনা সমাপ্ত।

পনের

শুক ও পেঁচার গল্প

সেকের আশ্রমে এক শিমুল গাছ ছিল। রাত্রিকালে সেই গাছে এক শুক পাখী ও এক পেঁচা বাস করত। একদিন সেই পেঁচা সারা রাত্রি বিচরণের পর প্রাতঃকালে ঐ গাছে ফিরে এল। সে যখন গাছের ডালে বসতে গেল শুকের দেহ শিশিরজলে ভিজে গেল।

শুক ক্রুদ্ধ হয়ে পেঁচাকে বলল, 'ওরে পাপিষ্ঠ নিশাচর পেঁচা, তুই কেন শিশিরজলে আমার সমস্ত গা ভিজিয়ে দিলি? অধিকন্তু আজ সকালবেলা অমঙ্গলদর্শন ঘটল, অস্পৃশ্য ব্যক্তির দর্শন হোল, তার পায়ের জলে আমার গা ভিজে গেল। জানি না আজ ভাগ্যে কি ঘটবে?'

শুকের কথা শুনে পেঁচাও ভীষণ ক্রুদ্ধ হোল। সে বলল, 'ওরে শুক, তুই তো স্বল্পজীবী পরবশ; তোর মুখে আমার নিন্দা সাজে না। তুই শুধু নিজের মাহাত্ম্যের বড়াই করছিস। আমি কেন দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াই না, তা শোন—কলিযুগে মানুষ বড় দুঃখী, তাই দেখে আমার মনে খুব ব্যথা। দিনমানে কিছু লোক শীত, গ্রীষ্ম, ঝড় সহ্য করে মাথায় কাদা বইছে; কিছু লোক জমিতে কুদাল বহন করে মাটিতে পুঁতে রাখে; কখনো বা একে অন্যকে ধরে উৎপীড়ন করে। তাদের এমনতর অবস্থা আমি সহ্য করতে পারি না। অন্যদিকে রাত্রিবেলা কেন ভ্রমণ করি তাও শোন—ঐ সময় কেউ নাচ করে, কেউ ভোজন করে, কেউ ভার্যার সঙ্গে নিদ্রা যায়, কেউ বা সুখে বিহার করে। এসব কারণেই রাত্রিতে ঘুরে বেড়াই। রাত্রিতে সব কিছুই

মঙ্গলকর; কেউ পাখার বাতাস খেয়ে সুখ করে, কেউ মনের আনন্দে উদর পূরণ করে, কেউ বা সঙ্গীতাদি আলাপ করে।'

এই কথার পর পেঁচা ও শুকের মধ্যে ভীষণ বিবাদ শুরু হল। পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আহত হয়ে তারা সেকের উঠানে পতিত হল। মধুকর নামক বণিকের হাতে শুক ধরা পড়ল এবং দানা নামক ধোপার হাতে পেঁচা ধরা পড়ল। ঐ শুকের পায়ে সোনার টেকা আংটি ছিল। মধুকর শুকের পা থেকে আংটি খুলে নিয়ে পলায়নে উদ্যত হল। দানা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আংটি ভাগ করে আমাকে কিছু দাও।'

কিন্তু মধুকর দানার প্রস্তাবে রাজী হল না। তখন দানা সেককে সেলাম করে সমস্ত ঘটনা জানাল। সে অভিযোগ করল, 'বাবুমশাই, আমি সোনার আংটির ভাগ পাব না কেন?'

সেক বললেন, 'তোমরা দুজনেই পাখী দুটি ছেড়ে দাও।'

মধুকর বলল, 'আমি এই শুকের মাংস খাব, তাহলে সর্বজ্ঞ হব; যে আমাকে দেখবে সেই আমার বশীভূত হবে।'

তার কথা শুনে শুক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'শুনুন, আমি ক্ষীণকায়; আমার আংটি গ্রহণ করে আমাকে মুক্ত করুন। আপনারা পেঁচাকে বধ করুন।'

কথা শুনে ভীত পেঁচা বলল, 'হে মহাত্মা, ঐ আংটির দাম অল্প, আমি আপনাদের বহু ধনের সন্ধান দিতে পারি।'

সেক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে?'

পেঁচা বলল, 'মহাশয় শুনুন, এই বনে অমাবস্যায় মাঝ রাত্রিতে একটি ঘট ঘুরে বেড়ায়। তার ভিতর অমূল্য ধনসম্পদ আছে। ঐ ঘটের উপর বঙ্করাজ নামক মহাসর্প বিরাজ করে। সে বনের পতঙ্গ ধরে ভক্ষণ করে। আর মাত্র একদিন পরেই অমাবস্যা। ঘটের উপরে বিদ্যমান সেই সাপের নিশ্বাসে চার পাশের জিনিস পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ঐ সাপকে হত্যা করতে

পারবে, সে ঐ ঘটের সমস্ত ধনসম্পদ লাভ করবে। কিন্তু আপনি শুককে মুক্তি দেবেন না।'

পেঁচার মুখে একথা শুনে সেক বললেন, 'অমাবস্যা আসুক। শুক, তুমি ভয় পেও না। তোমার পায়ে সোনার আংটি এল কেমন করে সেই কথা বল।'

শুকের আত্মকথা

শুক সভয়ে বলল, "মহাত্মা শুনুন, পূর্বে শাকাদিত্য নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটালেন। তাঁদের গ্রামে এক শুঁড়ি বাস করতেন। সেই শুঁড়ি একবার বাণিজ্যে গিয়েছে। তার বাড়ীতে যে গরুটি ছিল, সেটি প্রতি রাত্রিতে বাড়ীর বাইরে গিয়ে উদরপূর্তি করে ঘরে ফিরত। শুঁড়ির বাড়ীর পাশে এক তেলি বাস করত। শুঁড়ি-বউ রাত্রিতে তেলির কাছে তেল কিনে ঘরে ফিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে গরুটিকে দড়িতে বাঁধত। তারপর শুয়ে পড়ত। ভাগ্যচক্রে ঐ তেলির সঙ্গে শুঁড়ি-বউয়ের ভালবাসা হল। এভাবে কিছুকাল কাটল। কিন্তু প্রতিবেশীরা ঐ ব্যাপার জানতে পারল। তারা রাজার কাছে নালিশ করল। সুযোগমত তারা তেলি ও শুঁড়ি-বউকে হাতেনাতে ধরে ফেলল এবং রাজার কাছে হাজির করল।

রাজা শুঁড়ি-বউকে খুব তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, 'এই শুঁড়ি-বউকে কান ও নাক কেটে দিয়ে রাজ্য থেকে বহিষ্কার কর এবং এই তেলির শিরশ্ছেদ কর।'

রাজার আদেশ শুনে শুঁড়ি-বউ রাজাকে বলল, 'মহারাজ, ধর্ম ত্যাগ করবেন না।' তারপর ধর্মের নামে শপথ করে সে আবার বলল, 'আমার স্বামী ফিরে আসুন। তিনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, তাহলে ভালই ; নতুবা তিনিই যথোচিত

শাস্তির বিধান করবেন। আপনি আমাকে এই শাস্তি দিতে পারেন না। আমার স্বামী যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, তবে কে আমাকে গ্রহণ করবে? আমি পুরুষ ছাড়া একদিনও বাঁচতে পারব না; তাই ধর্মের নামে এই শপথ করছি। যেহেতু নৃপতিরা সমীপস্থ ব্যক্তিকেই সেবা করেন, সে ব্যক্তি মূর্খ, নীচকুলজাত অথবা অপদার্থ যাই হোক তার বিচার করেন না। সাধারণতঃ নৃপতি, নারী ও লতা পার্শ্ববর্তী বস্তুকে অবলম্বন করে। সুতরাং আমাকে বধ করা আপনার উচিত হবে না। আপনি সভাসদ পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করুন।'

রাজা হাসতে হাসতে পণ্ডিতদের কাছে সেই প্রশ্ন রাখলেন। তাঁরা ঘটনার পরিচয় নিয়ে বললেন, 'মহারাজ, একে বেঁধে রাখুন। এর স্বামী ফিরে আসুক। শাস্ত্রমতে স্ত্রী সর্বদা অবধ্যা।'

বিচারক পণ্ডিতদের কথামত রাজা শুঁড়ি-বউকে তেলির ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর রাজা এক রাত্রিতে পত্নী সাবিত্রীর সঙ্গে বিহারকালে শুঁড়ি-বউয়ের কথা মনে করে হেসে ফেললেন। রাজপত্নী সাবিত্রী ভয়ে কম্পিতচিত্তে ভাবলেন, 'মহারাজ কি আমার কোন অসৎ কাজ জানতে পেরেছেন, তাই এমন হাসছেন!' এরূপ চিন্তা করতে করতে তিনি মৌনী হয়ে রইলেন।

স্ত্রীকে বিমনা দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রানী, এমন মনমরা হয়ে আছ কেন?'

রানী সাবিত্রী স্বামীকে প্রণাম করে বললেন, 'মহারাজ, আপনি হয়ত আমার কোন অপব্যবহার দেখে হাসছিলেন, তাই আমি ভয়ে চুপ করে ছিলাম।'

'ভয় নেই, স্থির হও।' রাজা রানীকে একথা বলে শুঁড়ি-বউয়ের ঘটনা জানালেন।

সেই ঘটনা শুনে রানী দুর্ভাগ্যবশে বলে ফেললেন, 'মহারাজ, ওসব কাজ কিভাবে করতে হয় শুঁড়ি-বউ ঠিকমত জানে না।'

রাজা মনে মনে ভাবলেন, 'এই পাপীয়সী অভাব দুষ্টা। পর-পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার শুঁড়ি-বউ জানে না, উনি জানেন!'

ক্রুদ্ধ রাজা খড়্গ গ্রহণ করে রানীর কেশ আকর্ষণপূর্বক তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তিনি রানীকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন, 'পাপিষ্ঠা, শুঁড়ি বউ জানে না, তুমি জান!'

তখন আমি (শুক) রাজাকে নিবৃত্ত করে বললাম, 'মহারাজ, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করবেন না; আমি জানি রাজপত্নী সতীসাধ্বী, তিনি কখনো অন্যায় কাজ করতে পারেন না।'

শুকের কথা শুনে রাজা রানীর কেশ কর্তন করে তাকে মুক্তি দিলেন। রানী বহুক্ষণ রোদন করলেন; তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি যদি আমায় হত্যা করতেন, তাই ভাল হোত,—তাহলে লোকে এই হতভাগিনীর কথা ভুলে যেত। এখন আমার কেশ কর্তিত, তা দেখে লোকে বলবে এই রাজরানী পরপুরুষে আসক্তা; সেই কারণে রাজা স্বয়ং তার কেশ ছিন্ন করেছেন, আর অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। আমি যদি দুশ্চরিত্রা হই, তাহলে তুমি ভালই করেছ; কিন্তু আমি যদি সতীসাধ্বী হই, তাহলে বিধাতা তোমাকে অচিরেই এই কাজের সমুচিত ফল দান করবেন।'—এই কথা বলে সেই রানী আমার পায়ে সোনার আংটি পরিয়ে দিয়ে আমাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে বললেন, 'শুক, তুমি ইচ্ছামত উড়ে চলে যাও।' শেষকালে সেই রানী অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

দেব, আমার নিজের কাহিনী সংক্ষেপে আপনার কাছে নিবেদন করলাম।"

সোনার আংটির কথা শুনে সেক শুক পাখীকে বললেন, 'তুমি এখন নিজের আবাসে ফিরে যাও। এবার পেঁচার কাহিনী শুনব।'

অমাবস্যা তিথি উপস্থিত হলে সেক পেঁচাকে বললেন, 'ওহে উলূক, তুমি ঘটের মধ্যে যে ধনসম্পদের কথা বলছ, তার প্রমাণ কি?'

সোনার ঘড়া

পেঁচা বলল, 'এই বনে অমাবস্যায় অর্ধরাত্রিতে সেই সুবর্ণকলস ঘুরে বেড়ায়। সেই কলসের উপর বঙ্করাজ নামক মহাসর্প বাস করে। তার নিশ্বাসেই প্রাণীরা মারা যায়। কে এমন আছে যে সেই সাপের সম্মুখে যেতে পারে! আমি নিজে আপনাকে সেই কলস দেখাব।'

সেক সেই রাত্রিতে নাগমণি সঙ্গে নিয়ে সেটি সামনে রেখে অপেক্ষা করতে থাকলেন। মধ্যরাত্রিতে সেই কলস ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হল। সেক তৎক্ষণাৎ মণিটি হাতে নিয়ে সাপকে দেখালেন। মহাসর্প বঙ্করাজ মণি দর্শনমাত্রই বিদীর্ণহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করল।

সেক বণিক মধুকরকে আদেশ করলেন, 'ঐ কলসটি নিয়ে এস এবং সাপটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর।'

সেকের দুই কর্মচারী দানা ও মধুকর মরা সাপটিকে তুলে নিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করল। কিন্তু সাপ তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে ঐ দুজনকে গিলে ফেলতে উদ্যত হল এবং তারপর সেকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দানা ও মধুকর সেককে সাপটি দেখিয়ে সাবধান করল। সেক পুনরায় মণি দেখালেন; সাপ সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল।

সেক পুনর্বার মধুকরকে আদেশ করলেন, 'ঐ কলসী এনে এখানে ঢাল।' কলসী উপুড় করা মাত্রই নানাবিধ কুণ্ডল, কঙ্কণ প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি আবার আদেশ দিলেন, 'সব ধন তুলে রাখ।'

ধনরত্নের লোভে সেবক মধুকর সেককে বলল, 'প্রভু, আমরা আপনার দাস; আমরা দুজনে কুণ্ডল আর কঙ্কণ ভাগ করে নিচ্ছি।'

সেক বললেন, 'এমন অমূল্য সম্পদ তোমরা কিছুতেই নিতে পারবে না। এ কাজ তোমাদের ভালো হবে না।'

বণিক মধুকর তখন সাষ্টাঙ্গে সেকের পায়ে পড়ে বলল, 'আমি আজীবন আপনার দাস, তাই আমাকে ঐ কুণ্ডল দান করুন।'

সেক তাকে প্রার্থিত কুণ্ডল দান করে বললেন, 'ওহে বণিক, এটি রাজার সম্পত্তি, সুতরাং কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

বণিক মধুকর বলল, 'তাই হবে।'

তারপর সেক তার সেবক রজক দানাকে দুটি অঙ্গদ দান করলেন।

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ধর্মোপাখ্যান সমাপ্ত।

ষোল

চৈত্রাবলী মহোৎসব উপলক্ষ্যে বহু লোক গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন। রাজাও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গমন করেছেন। সেই বণিক মধুকরও বেশভূষায় সজ্জিতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত। হলায়ুধ মিশ্র ও জয়দেব মিশ্র দুজনেই ব্রাহ্মণীদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছেন। রাজার সঙ্গে রাজপত্নী বল্লভা এবং শশিকলা ও বিদ্যুৎপ্রভা রয়েছেন।

গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য রাজা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও মাংসের সঙ্গে সোনার শেকলে গাঁথা একটি মহামূল্য মণি নামিয়ে

রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক চিল মাংসের লোভে উড়ে এসে নখের দ্বারা সেই মণিটি হরণ করে পালিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে হাহারব উঠল। অনেক অনুসন্ধানের পরেও সেই মণির খোঁজ পাওয়া গেল না। দুঃখী রাজা বিমনা হয়ে রইলেন। 'মহাত্মা যোগী আমাকে এই মণি দান করেছিলেন ; কিন্তু যে সন্ন্যাসী কড়ি সংগ্রহের জন্য ভিক্ষা করেন, তিনি এমন মহামূল্য মণি দান করলেন কি করে ?'—এসব কথা চিন্তা করতে করতে রাজা উদ্বিগ্নহৃদয়ে কাল কাটাতে লাগলেন।

মাধবী ও মধুকর

এই সময় সেই বণিকবধূ মাধবী স্বামী মধুকরের সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে এসেছেন। মাধবীর হাতে কাঁকন, বণিকের কানে কুণ্ডল। বণিক ও মাধবীকে দেখে রানীর পরিচারকগণ তাদের বেশভূষার সংবাদ দিয়ে বলল, 'রানীমা, আপনি কি সামান্য অলংকার পরেছেন ! আর মাধবী বণিকের স্ত্রী হয়ে দুই হাতে কাঁকন পরে এসেছে ; তাই তার আগুনের মত রূপ, চোখ দিয়ে তাকান যায় না। তাছাড়া তার স্বামী বণিক মধুকরও কানে কুণ্ডল পরেছেন ; সেও আপনি তাকিয়ে দেখতে পারবেন না।'

একথা শুনে রাজরানী বল্লভা ঐ বণিগ্‌বধূ মাধবীকে আনতে নিজের পরিচারিকাকে পাঠালেন। পরিচারিকা সেখানে পৌঁছে বণিক-দম্পতিকে বলল, 'বনিগ্‌বধূ, 'রানীমা বল্লভা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠালেন ; আপনি স্বামীকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে আসুন।'

কথা শুনে মাধবী বললেন, 'তাঁকে আমার কথা বোলো যে স্নান শেষ করে আমি স্বামীর সঙ্গে তাঁর কাছে যাব।'

কিন্তু পরিচারিকা ফিরে এসে রানীকে বলল, 'রানীমা, মাধবী আপনার কথামত স্বামীর সঙ্গে আসতে রাজী হলেন না।'

তার কথা শুনে রাজপত্নী স্বয়ং তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি মাধবীকে বললেন, 'পাপিষ্ঠা বণিক্‌বউ, আমার কথার অবমাননা করলে কেন? এই কাঁকন তুমি কোথায় পেয়েছ?'

মাধবী উত্তর দিলেন, 'রানীমা শুনুন, আমি বণিকের স্ত্রী, বণিকের পুত্রবধূ; আবার বণিকের কন্যাও। আমাদের বাড়ীতে অনেক সোনাদানা থাকে।'

রাজরানী বললেন, 'কিন্তু আমার ভাণ্ডারে তো এমন কাঁকন নেই।'

মাধবী বললেন, 'আপনার ভাগ্য তেমন নয় তাই।'

একথা শুনে রানী ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে পাপিষ্ঠা, আমার তেমন ভাগ্য নেই! তোর ভাগ্য আমার চেয়ে বেশী।' একথা বলে তিনি মাধবীর হাত ধরে টানতে টানতে সেই কাঁকন খুলে নিলেন আর পরিচারককে আদেশ করলেন, 'মাধবীর স্বামী মধুকরের কান থেকে কুণ্ডলজোড়া ছিনিয়ে আন।'

পরিচারক তাঁর কথামত মধুকরকে উৎপীড়ন করে কুণ্ডল ছিনিয়ে নিল। এই সময় খুব সোরগোল হল। মাধবী তার স্বামীর সঙ্গে সেকের সমীপে হাজির হলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে সেকের কাছে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন।

অন্যদিকে রাজরানী ঐ কাঁকনজোড়া নিজের হাতে পরলেন এবং কুণ্ডলদুটি নিজের ছেলেকে পরতে দিলেন। তারপর তিনি পদ্মাবতী ও হলায়ুধ মিশ্রের সঙ্গে সেকের আবাসে গেলেন। খবর পেয়ে রাজাও সেখানে পৌঁছালেন। তারপর বণিকবধূ মাধবীর সঙ্গে রানীর কলহ শুরু হল। রাজা লজ্জায় অধোমুখে রইলেন। সেকও কোন কথাবার্তা বললেন না।

মাধবী রাজরানীকে তর্জন করে বললেন, 'রাজপত্নী, নিজেকে খুব বড় বলে ভাবেন? এই কাঁকন সেক আমাকে দান করেছিলেন। কিন্তু আপনি এমনই বেহায়া যে বলপূর্বক সেই কাঁকন

কেড়ে নিয়ে তাই আবার নিজের হাতে পরেছেন। যদি নিজের মঙ্গল চান তাহলে আমার কাঁকন ফিরিয়ে দিন। পরের অলংকার পরতে আপনার লজ্জা হয় না?'

উপস্থিত ব্যক্তিরা ভয়ে কোন কথা বলতে সাহস পেলেন না। তখন রাজা বল্লভাকে খুশী করার জন্য বললেন, 'রানী, তুমি এত ছোট হচ্ছ কেন? সেকের দেওয়া কাঁকন তুমি নিচ্ছ কেন? কুণ্ডলগুলিও ফিরিয়ে দাও।'

স্বামীর কথা শুনে রানী তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'মহারাজ, মেয়েদের ব্যাপারে তুমি কথা বলছ কেন? সেক না হয় আমাদের খুব অনুগ্রহ করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু তুমি কি নিজের চোখে দেখেছ যে সেক মধুকর বণিকের বউকে কাঁকন আর কুণ্ডলজোড়া দিয়েছেন? সেক তোমাকে কি দিয়েছেন? তোমার আর আমার মুখে ছাই দিয়েছেন!'

মাধবী পুনরায় রানীকে বললেন, 'ওগো কুঁদুলে রানী, নিজের বেশ মহত্ত্ব দেখালে! পূর্বে তুমি আমাকে পদাঘাত করেছিলে, এখন তার প্রতিশোধ নেব। কাঠুরে-বংশের খুব মহত্ত্ব আছে!'

রাজা সেই অলংকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রানীকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। রানী নিজের ছেলেকে ডেকে এনে তার কাছ থেকে কুণ্ডলগুলি খুলে নিতে চাইলেন। কিন্তু সেক তাকে নিষেধ করলেন এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বললেন। সেক মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে হলায়ুধ মিশ্রের কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, 'ব্রাহ্মণ, এই বনিগ্‌বধূ অতি চপলমতি; উনি রানীকে বলেছেন যে, যেহেতু রানী তাকে পীড়ন করেছেন, তাই উনিও রানীকে পীড়ন করে শোধ তুলবেন। শুনেছি আপনাদের শাস্ত্রে বলে যে নীচ ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করলে প্রভুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, যেমন মূষিক মুনির দ্বারা বাঘে পরিণত হয়ে সেই

মুনিকেই হত্যা করতে গিয়েছিল। আপনি এই উপদেশের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলুন।'

তখন হলায়ুধ মিশ্র সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে তাকে শোনালেন। অতঃপর সেক বণিক মধুকরকে বললেন, 'ওহে মধুকর, এখানে এস। তুমি যখন পূর্বে আমার কাছে কাঁকন ও কুণ্ডল চেয়েছিলে, তখনই আমি তোমাকে বলেছিলাম এই জিনিস নেওয়া তোমার পক্ষে ভাল হবে না ; বরং অন্য কোন ধনসম্পদ নাও। কিন্তু তুমি আমার পায়ে ধরে তাই নিলে। তবুও কাঁকণ আর কুণ্ডল নেওয়ার পর বলেছিলাম কখনো লোকসমক্ষে এ জিনিস দেখিও না। এখন রাজরানী সেই অলংকার জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমার কথা ঠিকমত পালন করলে না রাজরানী যে অলংকার পরতে পারেন না, তুমি নিজে তাই পরেছ?'

সেক মাধবীকে বললেন, 'বণিগ্‌বধ্‌, রাজরানী রাজার প্রাণের অপেক্ষাও বড়। কিন্তু তুমি কে? রাজা যদি রাজ্য থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেন, তাহলে কে তোমাকে রক্ষা করবে? কিংবা যদি তোমার স্বামী আর তোমাকে হত্যা করেন, তাহলেই বা কে তোমাদের রক্ষা করবে? যখন তোমার স্বামী মুমূর্ষু ছিল, তখন তুমি বলেছিলে যে তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবে, তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দান করবে। রাজা আমাকে সেকথা জানালেন : তাহলে এখন তিন লক্ষ টাকার অর্ধেক দাও। তখন আমি রাজাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে আপনি একজন বিরাট রাজা, আপনার রাজ্যে এমন বণিকও আছে যিনি তিন লক্ষ মুদ্রার মালিক। আমার কথা শুনে রাজা তোমার স্বামীকে মাফ করেছিলেন। তাহলে এখন কেন আমার সামনে রানীর সঙ্গে কলহ করছ আর বলচ যে রানী অকারণে তোমাকে পীড়ন করেছেন। যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাও, তাহলে আমার কথামত স্বামীর সঙ্গে রাজরানীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। নতুবা

আমার কোন দোষ থাকবে না। রাজা হলেন সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁর সমান আর কে আছেন?'

তখন বণিগ্‌বধূ মাধবী ভয়ে ভয়ে স্বামীর সঙ্গে রানীর পায়ে পড়লেন। রানী কাঁকন ফিরে পেয়ে সেকের কথামত ঘরে ফিরলেন। অতঃপর সেক সেই কলসীর সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে এলেন। তিনি প্রথম জয়দেব মিশ্রের ঘরণী পদ্মাবতীকে একজোড়া কাঁকন দান করলেন এবং তারপর হলায়ুধ মিশ্রকে একজোড়া কুণ্ডল দান করলেন। তিনি উভয়কে গৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। সেক জয়দেব মিশ্রকেও একজোড়া কুণ্ডল দিয়ে বাড়ী পাঠালেন। রাজা একজোড়া মহামূল্য কুণ্ডল লাভ করলেন। একজোড়া কুণ্ডল পেলেন গাঙ্গ নামক নট। বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা প্রত্যেকে এক-এক জোড়া কাঁকন পেলেন।

সরস্বতীর মহিমা

তারপর সেক সমস্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, 'এই ধোয়ী একজন তন্তুবায়; তবু ইনি মহাপণ্ডিতরূপে সকলের মধ্যে প্রশংসিত হলেন কেন? লোকে ব্রাহ্মণের বিদ্যারই প্রশংসা করে। তাহলে ধোয়ী পণ্ডিত বলে সম্মান পান কেন? আপনারা বলুন।'

ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "আমাদের কথা শুনুন। রাজা লক্ষ্মণ-সেনের পিতা বল্লালসেন ভুবনবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি চারজন ব্রাহ্মণকে মন্ত্রপাঠ ও ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য গঙ্গাতীরে পাঠালেন এবং তন্তুবায় ধোয়ীকে তাদের সেবকরূপে সঙ্গে পাঠালেন। ধোয়ী ব্রাহ্মণদের সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। চারজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সেখানে তেল মাখার পর অবশিষ্ট তেলটুকু তন্তুবায় ধোয়ীকে দান করতেন। কোন একদিন ব্রাহ্মণেরা ধোয়ীকে বললেন, 'আজ আমরা তোমার সঙ্গেই ঘরে ফিরব।'

ধোয়ী বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ এ ঘটনা জানলে হয়ত আপনাদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার অপরাধের জন্য হাত-পা কেটে ফেলবেন।'

তাঁর মুখে একথা শুনে ব্রাহ্মণরা তাঁর হাত-পা বেঁধে সেখানে রেখে নিজ নিজ ঘরে ফিরলেন। তারপর রাত্রিতে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়ে ধোয়ীকে বললেন, 'বৎস, চারজন ব্রাহ্মণ কোথায় গিয়েছেন?'

তন্তুবায় ধোয়ী বললেন, 'হে দেবী, হে মাতঃ, ব্রাহ্মণেরা আমাকে বেঁধে রেখে আপন আপন ঘরে ফিরে গেছেন।'

দেবী বললেন, 'বন্ধনমুক্ত হয়ে আমার কাছে এস।'

ধোয়ী বন্ধনমুক্ত হয়ে দেবীর কাছে এগিয়ে এসে বারংবার তাঁকে প্রণাম জানালেন।

দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণেরা কেন তোমাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে চলে গেলেন?'

ধোয়ী উত্তর দিলেন, 'হে দেবী, হে মাতঃ, ব্রাহ্মণেরা বললেন, আমরা সকলে একসঙ্গে ঘরে ফিরব; কিন্তু আমি রাজার ভয়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজী হলাম না।'

দেবী সরস্বতী বললেন, 'ঐ ব্রাহ্মণেরা বৎসরকাল যাবৎ আমার উপাসনা করেছেন। এখানে মণ্ডপের মধ্যে একটি জলপূর্ণ ঘট আছে, ব্রাহ্মণেরা ফিরে এসে ঐ ঘটের জল পান করুক।' একথা জানিয়ে দেবী অন্তর্হিতা হলেন।

সরস্বতীর মুখে একথা শুনে ধোয়ী মনে মনে ভাবলেন, ব্রাহ্মণেরা আমাকে এখানে আটক করে রেখে গেছেন, তাই ঐ ঘটের জল আমি তাঁদের দেব না।' এই ভেবে তন্তুবায় ধোয়ী ইচ্ছামত ঘটের জল পান করলেন এবং বাকী জল গঙ্গায় ফেলে দিলেন। পরদিন সকালবেলা ধোয়ী রাজপ্রাসাদে ফিরলেন। তখন কয়েকজন ব্রাহ্মণ একটি শ্লোক পাঠ করছিলেন; তার অর্থ হল—

অনন্ত রত্নের আকর যে সমুদ্র, শীতলতা তার সৌভাগ্যকে ম্লান করতে পারে না ; কারণ যেখানে বহুগুণের সমাবেশ, সেখানে একটি মাত্র দোষ ঢাকা পড়ে যায়,--যেমন চাঁদের অনন্ত কিরণ-রাশির মধ্যে তার কলঙ্ক অবলুপ্ত হয়।

সভাসদ্গণ সকলে বলে উঠলেন, 'কালিদাস ঠিকই বলেছেন, যথার্থ বলেছেন। অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ঢাকা পড়ে যায়।'

তাঁদের কথা শুনে ধোয়ী সভার মধ্যে বলে উঠলেন, 'আমি একথা মানতে রাজী নই। একমাত্র আমিই এই উক্তির উত্তর দিতে পারি, অন্য কেউ উত্তর দিতে অসমর্থ।'

তখন ব্রাহ্মণেরা বলে উঠলেন, 'ওহে পাপিষ্ঠ তন্তুবায়, কালিদাসের কাব্যের উত্তর দেবে তুমি ? তোমার কি প্রাণের মায়া নেই ? আচ্ছা কি উত্তর জানো বল।'

তন্তুবায় ধোয়ী নিষ্ঠাসহকারে বললেন, 'আপনারা সব সভ্য মিলে শুনুন —'দারিদ্র্যম্ একো গুণরাশিনাশী।' অর্থাৎ বহুগুণের মধ্যে একটিমাত্র দারিদ্র্য-দোষ সব গুণকে নাশ করে।'

উত্তর শুনে সকলে তাকে 'ধন্যবাদ দিলেন।'

সেক বুঝলেন এই তন্তুবায় পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাকে একজোড়া কুণ্ডল দান করলেন। তারপর তিনি সেই বণিক-দম্পতিকেও যথাবিধি কিছু অলংকার দান করে ঘরে পাঠালেন।

রাজসভায় শশিকলা ও বিদ্যুৎপ্রভা

তারপর ইন্দ্রসভার ন্যায় সেকের সভা বসল। শশিকলা ও বিদ্যুৎপ্রভা সঙ্গীত শুরু করলেন। মন্ত্রী ব্যতীত উপস্থিত সকলেই গানের জন্য উভয়কে অভিনন্দন জানালেন। সেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্ত্রী, গানের প্রশংসা করছেন না কেন ?'

বিদ্যুৎপ্রভা জানালেন, 'মন্ত্রী আমাদের উপর রুষ্ট।'

মন্ত্রী বললেন, 'পাপীয়সী, নির্ভয়ে আমার নিন্দা করছ! তুমি বলছ আমি তোমার সঙ্গে প্রায়ই কলহ করি।'

সেক রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, এ কেমন নিয়ম?'

রাজা বললেন, 'তা জানি না।'

সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিদ্যুৎপ্রভা, মন্ত্রীর সঙ্গে তোমার বিবাদের কারণ কি?'

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'মন্ত্রীকে সকলেই অবনতমস্তকে অভিনন্দন জানায়। আমরা হলেম যাচক, উনি মহামন্ত্রী; ওঁর সঙ্গে আমরা বিবাদ করব কেন?'

মন্ত্রী জানালেন, 'এই বিদ্যুৎপ্রভার শ্বশুর গাঙ্গনট সর্বদা আমার নামে নিন্দা রটায়।'

কিন্তু সেক মন্ত্রীর কথার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। মন্ত্রী বললেন 'বিদ্যুৎপ্রভাই বলুক আমার কি দোষ।'

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'আমার কথা আপনি মানবেন কেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'আপনার কথাই সত্য বলে গৃহীত হবে। বলুন, আমার কি দোষ?'

অবশেষে তাই ঠিক হল—তার কথাই প্রমাণ বলে মান্য হবে। বিদ্যুৎপ্রভা মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বললেন, 'মন্ত্রী, আমায় মার্জনা করুন, মার্জনা করুন।'

কিন্তু মন্ত্রী তার কথা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন বিদ্যুৎপ্রভা লজ্জা ত্যাগ করে তার বক্তব্য পেশ করুক।

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, "কোন একদিন মন্ত্রী লোক পাঠিয়ে আমাকে ও শশিকলাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'নর্তকীরা, একবারের জন্যও আমাকে ভজনা কর, তোমরা দুজনেই আমার সেবা কর।'

আমরা উভয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তাই করব। আমরা আপনার তৃপ্তিমত সেবা করব।'

তারপর আমরা সঙ্কেতমত রাত্রিতে তাঁর গৃহে হাজির হলাম। সেখানে তাঁর সঙ্গে বিবিধ ভোগসুখে রাত্রি কাটল। সকালবেলা মন্ত্রী আমাদের বিশ মুদ্রা পারিশ্রমিক দান করতে চাইলেন। তখন আমরা দুজনে তাঁকে কটূক্তি করে বললাম, 'আপনি রাজার মুখ্যমন্ত্রী, রাজার তুল্য ব্যক্তি। আমাদের পঞ্চাশ মুদ্রা পারিশ্রমিক এবং যথাযোগ্য অলংকার দিন।' আমরা তাঁকে বারবার সেই অনুরোধ করলাম, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই লাভ হল না। অবশেষে আমরা গৃহে ফিরলাম এবং নিজ নিজ শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেই ঘটনা জানালাম। আমরা মন্ত্রীর সেই বিশ মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এই কারণেই আমাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ।"

তাঁদের কথা শুনে মন্ত্রী 'হা হতোঽস্মি' বলে মাটিতে বসে পড়লেন। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'ওহে সভা-সদগণ শুনুন, এই দেশে যে এমন বিধান চলে তা কে জানত; তাই ভাল। অন্যথায় এই পাপীয়সী নর্তকীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব।'

বিদ্যুৎপ্রভা প্রত্যুত্তর দিলেন, 'মন্ত্রী, আপনি আমার সঙ্গসুখ উপভোগ করলেন, তার বিনিময়ে কানাকড়িও দিলেন না; আবার কিনা শাস্তি দিতে চাইছেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছ, তার কোন সাক্ষী আছে?'

বিদ্যুৎপ্রভা উত্তর দিলেন, 'যে মানুষ পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ করে, সে কি সাক্ষী হাজির রেখে তেমন কাজ করে? সাক্ষীর কথা বলতে আপনার লজ্জা হয় না?'

কিন্তু মন্ত্রী বিদ্যুৎপ্রভার এই উত্তর মানতে রাজী হলেন না। বিদ্যুৎপ্রভা পুনরায় বললেন, 'আপনি এই সভায় বলেছেন যে আমার কথা মানবেন। এখন তা অগ্রাহ্য করছেন কেন?'

তাদের কথাবার্তা শুনে রাজা অধোমুখে রইলেন। সেক ছাড়া অন্যান্য সকলেই রাজার ন্যায় অধোমুখ হলেন।

সেক মনে মনে ভাবলেন, 'এই রাজ্যে এমন কাণ্ডকারখানা হয়ত চলে।' দুই পক্ষের বিবাদ শুরু হল। তা দেখে সেক রাজাকে বললেন, 'আপনার সম্মুখে দুই পক্ষের বিবাদ চলেছে। আপনি সবদিক বিচার করে ভালোমন্দ নির্ধারণ করছেন না কেন?'

রাজা কিছুই বলতে পারলেন না।

সেক চিন্তা করলেন, এই রাজ্যে মন্ত্রী পরদারাসক্ত। হয়ত রাজাও মন্ত্রীর মতই। তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ সভাসদ্‌গণকে বললেন, 'যে সভায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ উপস্থিত থাকেন না, সে সভা সভানামের যোগ্য নয়; যে বৃদ্ধেরা ধর্মকথা আলোচনা করেন না, তারা যথার্থ বৃদ্ধ নন; যার মধ্যে সত্য নেই, তা যথার্থ ধর্ম নয় এবং যার মধ্যে শঠতা আছে, তা সত্য নয়।' আপনারা রাজসভার সভাসদ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, সত্য কথা বলতে দ্বিধা কেন?'

ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, আপনি উপস্থিত থাকতে আমরা কি বলতে পারি।'

সেক জবাব দিলেন, 'ওহে বিপ্রগণ, আমাকে ভয় পাবেন না; এই রাজ্য আপনাদের চিরকালের বস্তু, আমি আপনাদের অতিথি মাত্র। আপনারা সবাই বিশিষ্ট বিদ্বান, অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি বিহিত করুন, অন্যথায় উভয় পক্ষকেই নির্দোষ বলে ঘোষণা করুন।'

তখন সভাসদ্‌ ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'ওহে মন্ত্রী, আমাদের সম্মুখে স্বীকার করলেন যে বিদ্যুৎপ্রভা তার অভিযোগ পেশ করুক, তার কথাই সত্য বলে মান্য করা হবে। কিন্তু এখন তা অগ্রাহ্য করছেন কেন? ক্রোধ মানুষের যশ ও কর্মের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। অধিকন্তু ধর্ম মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের যথাযথ সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং আমরা বুঝেছি যে আপনি অপরাধী, এর অন্যথা হবার নয়।'

ব্রাহ্মণদের বিচার শুনে মন্ত্রী রোদন করতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আমি তাহলে জলে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করব; নতুবা আর কি গতি আছে!'

বিদ্যুৎপ্রভা অবনতমস্তকে সকলকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আমি আমার অভিযোগের উপযুক্ত বিচার পেয়েছি।'

ভয়ে ভয়ে কেউ কোন কথা বললেন না। সেক আবার বললেন, 'বাদী তার অভিযোগ তুলে নিয়ে অভিযুক্তকে নিষ্কৃতি দিলেন।'

সেক নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভাকে কাছে ডেকে বললেন, 'নর্তকী, নানারূপ ব্যভিচার ও অন্যায় আচরণ করে এবং তারপর সেই কাজের জন্য মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করে এখন ক্ষমা করতে সম্মত হচ্ছ না কেন?'

বিদ্যুৎপ্রভা সেককে বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, যেমন অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণেরা বিনষ্ট হন, সন্তুষ্ট রাজারা বিনষ্ট হন, সলজ্জা গণিকা বিনষ্ট হয় এবং লজ্জাহীন কুলস্ত্রীরা বিনষ্ট হন—সেরূপ জানবেন যে দেশে মন্ত্রী পরদারাসক্ত, সেদেশে রাজাও তাঁর মত হবেন। যেখানে রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই পরদারাসক্ত, সেই রাষ্ট্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাতে কোন সংশয় নেই।'

সেক তার প্রশংসা করে বললেন, 'সাধু, সাধু! ধন্য এই নর্তকী!' অতঃপর তিনি তাকে বহুবিধ সামগ্রী উপহার দিয়ে ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন।

যে দেশের জনসভায় সেকের চরিতমাহাত্ম্য যথাযথ শ্রুত হয়,
সে দেশের সর্ব বিঘ্ন দূরে যায়; চোরভয় ও অগ্নিভয় নাশ হয়।

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাধনপ্রদান কাহিনী সমাপ্ত।

সতের
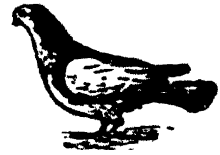
তখন নির্মল প্রাতঃকাল। দেশের অধিবাসীরা বিবিধ অলংকারে সজ্জিত হয়েছেন। সমস্ত নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর মত শোভা পাচ্ছে।

রাজ্যের মহাজনেরা রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, কলিযুগে এই সেকের মত দাতা দুর্লভ। ভাগ্যদোষে লোকে কানাকড়ি ভিক্ষা করে; কিন্তু এই সেক তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে অমূল্য ধনরত্ন বিতরণ করেন। উনি একজন মহাত্মা; দু-এক দিনের জন্য এদেশে আছেন, তারপর হয়ত অন্য কোথাও চলে যাবেন।' এভাবে নানান আলোচনা হল; কিন্তু সেকের চরিত কেউই যথাযথ জানত না। 'যেমন নিপুণ চিত্রশিল্পী সমতল পটে উঁচু-নীচু নানাবিধ আকারের ছবি এঁকে অসত্য বস্তুকে সত্যের ন্যায় দেখান, তেমনি এই সেক। তাই আমরা সকলে মিলে এমন একটা উপায় করব, যাতে তিনি আমাদের দেশেই থাকেন।'—সকলে বললেন। এসব কথাবার্তার পর সকলে সেকভবনে উপস্থিত হলেন। তারা সেককে প্রণাম জানিয়ে নিজেদের বক্তব্য নিবেদন করে দণ্ডায়মান রইলেন, আসনও গ্রহণ করলেন না।

সেক সকলকে বললেন, 'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এতে আমার অমঙ্গল হবে। যিনি আমাকে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করতে পারবেন, তিনিই আমার মঙ্গল সাধন করবেন। কিন্তু যিনি কপট বাক্যে মিথ্যা প্রশংসা করবেন তিনি আমার কাছে অপরাধী হবেন।'

সকলে বললেন, 'আপনি আমাদের বর দিন।'

সেক বললেন, 'আপনারা সকলে বসুন, তারপর মনের কথা বলুন।' সকলে উপবেশন করে সেককে জানালেন, 'আমাদের কথা শুনুন—আপনি জনসাধারণকে ধনসম্পদ বিতরণ করছেন; আমাদের আশঙ্কা, ধনসম্পদ দানের পর আপনি হয়ত অন্য কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু আমাদের মনোবাসনা এই যে আপনি আজীবন আমাদের দেশেই থাকুন।'

সেক বললেন, 'আপনারা শুনুন—পুরাণপুরুষ আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন, আমি তাই এসেছি। আপনারা আমার ব্যাপারে কোন ভয় রাখবেন না। আমি যে ধনসম্পদ বিতরণ করি, তাতেই বা আপনাদের কি প্রয়োজন। অর্থের অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে পরিতাপ এবং ভোগে মোহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং শুধু অর্থই কি সুখদায়ক হয়?—একথা জেনেই আমি অকাতরে ধনসম্পদ দান করি। অধিকন্তু উপার্জিত ধনসম্পদ ত্যাগের দ্বারাই রক্ষিত হয়, যেমন জলাধার থেকে জল নিষ্কাশিত করলেই কূলপ্লাবন বন্ধ করা যায়।'

সেক পুনরায় বললেন, 'যদি আপনাদের সকলের অভিমত হয়, তাহলে আমি এই রাজ্যে মসজিদ তৈরি করব। সর্বপ্রথম পাণ্ডুরাজ্যে একটি মসজিদ হবে।'

মন্ত্রী ব্যতীত সকলেই সেকের প্রস্তাবে রাজী হলেন। যখন রাজা মসজিদ নির্মাণের উপযুক্ত স্থানের কথা ভাবছিলেন, তখন সেক বললেন, 'আমি ছদ্মরূপে ঘুরে বেড়াব, যেখানেই উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে পারব, সেখানেই মসজিদ তৈরি করাব।'

অতঃপর সেক পাণ্ডুদেশে এলেন। তিনি এক গোয়ালার ঘরের দাওয়ায় বসলেন। গোয়ালা ঘরে ফিরে সেককে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? যাবে কোথায়? আমার বাড়িতে জায়গা হবে না।'

সেক বললেন, 'আজকের দিনটি আমাকে এখানে থাকতে দিন।'

সেক আরও বললেন, 'আমি যেই হই না কেন, আপনার কি দরকার?'

উভয়ের বাদ-প্রতিবাদে গ্রামের লোকজন হাজির হল।

সেক তাদের বললেন, 'আজকের দিনটি আপনারা আমাকে এখানে থাকতে দিন।'

গ্রামবাসীরা বললেন, 'আপনাকে স্থান দিলে আমাদের কি লাভ?'

সেক বললেন, 'অপেক্ষা করুন, তাহলে বুঝবেন কি লাভ।'

গোয়ালারা বললেন, 'যদি আমাদের সব গোবর সোনায় পরিণত করতে পারেন, তাহলে আপনি যা চাইছেন তাই পাবেন, কোন অন্যথা হবে না।'

সেক বললেন, 'আপনারা শুনুন—আমার একটি বাঘছাল আছে, এর দ্বারা যতটুকু স্থান আচ্ছাদিত হয়, ততটুকু জায়গা আমাকে দিন।'

গোয়ালারা সেকের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সেক তাদের বললেন, 'গোবরের উপর ছাই ছড়িয়ে দিন এবং তারপর ঘাস বিছিয়ে দিন। রাত্রিবেলা ঐ গোবর-গাদায় আগুন লাগিয়ে দিন। পরদিন সকলে একত্র হাজির হোন, তারপর দেখবেন কি হয়?'

'আচ্ছা তাই হোক।'—বলে তদনুরূপ আয়োজন করে সকলে বিদায় নিলেন। পরদিন সকালে গোয়ালারা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ছাই-ঢাকা সমস্ত গোবর সোনায় পরিণত হয়েছে। সেই সোনা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন।

সেক পুনরায় বললেন, 'এখন আমি বাঘছালের সমান জমি চাই।'

গোয়ালারা বললেন, 'যেখানে খুশী, ঐ জমি সংগ্রহ করুন।'

সেক উঠে দাঁড়ালেন এবং বাঘছালের দ্বারা জমি মাপতে শুরু

করলেন; বাঘছাল ক্রমশ বেড়েই চলল, তাতে সমস্ত গ্রাম আচ্ছাদিত হল। গ্রামবাসীদের দাঁড়ানোর স্থান পর্যন্ত রইল না।

জনগণ বলে উঠলেন, 'হায় কি দুর্ভাগ্য!'

সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কথা বলছেন কেন?'

জনগণ বললেন, 'আপনার মাহাত্ম্য দেখলাম। আদেশ করুন কি করতে হবে।'

সেক আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই, স্থির হোন। আজ থেকে সমস্ত গ্রাম আমার জিম্মায় রইল।'

জনগণ সেকের কথায় সম্মত হলেন। সেক বললেন, 'আমার বাঘছালের দ্বারা আচ্ছাদিত হাট-মাঠ-গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত জমিতে এক মসজিদ বানাব।'

কয়েক দিনের মধ্যেই রাজার কানে এই সংবাদ পৌঁছাল। তিনি সত্বর সেখানে উপস্থিত হলেন। শুভ দিনে শুভ নক্ষত্রে সেক নির্বাচিত জমিতে উপস্থিত হয়ে মৌন অবলম্বন করে সেখানে উপবেশন করলেন।

রাজা শঙ্কিতমনে সেককে বললেন, 'আপনি মৌনী হয়ে মাটিতে দশবার জলের অঞ্জলি দিলেন। এমন ব্যাপার শুনলেও দোষ ঘটে।'

সেক বললেন, 'না তা হয় না। পূর্বে আমার কথা শুনুন, তারপর আপনারা বিচার করবেন।'

রাজা বললেন, 'হা হতোঽস্মি! আপনার কথার ভালমন্দ বিচার করার মতো শক্তি আমার নেই।'

সেক তাকে অনুনয় করে বললেন, 'মহারাজ, শুনুন—

মধ্যে আছে পীরের মোকাম।
তস্যোপরি বিত্ততে প্রধান পুরুষের স্থান।
তীর্থাঞ্জলি তাহার নামে দান॥
পূর্বে উদয়াচল পর্বতের নাম।
উদয় সূর্য প্রত্যূষ বিহান।

ফিরাস্ত জানিয়া আমার মোকামের করিব সম্মান।
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান॥
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান।
তথা আমি করিব প্রয়াণ।
আমি গেলে তারা করিব সম্মান।
পঞ্চম অঞ্জলি তাহার নামে দান॥
আমার বাপমাহ দরিদ্রের পুত্র।
আমা জানীতে তাহারা পাইল বড় দুঃখ।
আমার জন্যে তার হোক আপ্যান।
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহার নামে দান॥
পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম।
কেহো বলে ভাল কেহো করে অপমান।
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান॥
রাজা হৈঞা আমার করিব সম্মান।
প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অন্নপান।
অষ্টম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান।
সহিঞাঁ দুঃখ যদি না করে আন।
পুনঃ পাছে দেয় সম্মান।
নবম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম।
কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ আরোগ্য দান।
আমি তাহার করিব ত্রাণ।
দশম অঞ্জলি তাহার নামে দান॥

তারপর সেক এক পুকুর কাটিয়ে গন্ধ ও চন্দনের দ্বারা তার প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এক স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। উপস্থিত সকলে সেকের জয়ধ্বনি শুনতে লাগলেন। নানান দিগ্‌দেশ থেকে ভিক্ষুকেরা

হাজির হল। মধুকর বণিক তাদের প্রত্যেককে আধা পয়সা ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন রাজা সব ছুতোর মিস্ত্রীদের ডেকে হাজির করালেন। সেক তাদের বললেন, 'এই জায়গায় তোমাদের এক বিখ্যাত মসজিদ তৈরি করতে হবে।'

মিস্ত্রীরা বললেন, 'মহাত্মা, মসজিদ বস্তুটি আমরা কখনো দেখিনি, তার কথাও শুনি নি; তাহলে সে জিনিস কি করে বানাব?' তখন সেক বললেন, 'তোমরা চোখে দেখলে তেমনটি তৈরি করতে পারবে তো?'

মিস্ত্রীরা বললেন, 'তাহলে নিশ্চয় পারব।'

তারপর সেক মিস্ত্রীদের কানে ধরে তুলে দিলেন। তারা সকলে 'বাবা গো' বলে কান্নাকাটি শুরু করলেন। অবশেষে সকলে বললেন, 'হে মহাত্মা, মসজিদ দেখা হয়েছে, আমাদের প্রাণ বাঁচান।'

অতঃপর রাজা মসজিদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা যোগাড় করালেন। কিন্তু কারিগর সকলে সেককে বললেন, 'আমাদের মজুরি যোগাবে কে? আপনি তো ভিক্ষুক।'

সেক তাদের বললেন, 'তোমরা সবাই এক-একটি বকুলপাতা সংগ্রহ কর, তারপর আমার আজ্ঞা অনুসারে লিখে নাও।'—এই বলে সেক নিজের মঙ্গল হাত দিয়ে সেই পাতাগুলি স্পর্শ করলেন এবং বললেন, 'হাটে গিয়ে ভেবেচিন্তে এই বকুলপাতার পুটলি মধুকর বণিকের কাছে জমা করবে। তা হলেই যার যা প্রাপ্য মজুরি তাই পাবে, অন্যথা হবে না।'

এভাবে কয়েক দিন কাটল। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে সেকের ব্যাপার খুবই আশ্চর্যের। বৈতালিকেরা রাজার সম্মুখে সেকের গুণগান গাইতে শুরু করলেন—

'বনের শাক খায় সেক বনের গোনা।
ভিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক,
হাটে বিকাইলে হয় সোনা।'

তারপর মন্ত্রী মিস্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমরা তেমন কাজ করবে যাতে দরজার মাথার কাঠ যেন কোনমতেই ছোট না হয়। তাহলে প্রথমেই তোমাদের অকল্যাণ হবে।'

মিস্ত্রীরা মন্ত্রীর কথামত কাজ করলেন। তারপর দরজার মাথায় সেই কাঠ যখন লাগান হল, তখন দেখা গেল তা ছোট। মিস্ত্রীরা সকলে হায় হায় করতে করতে দুঃখে মাটিতে বসে পড়লেন। ব্যাপার শুনে সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে, তোমরা মাটিতে বসে হাহুতাশ করছ কেন?'

মিস্ত্রীরা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'হে মহাত্মা, দরজার মাথার কাঠ ছোট হয়ে গেছে।'

সেক হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহে মিস্ত্রীরা, তোমরা কাঠের তলার দিকে ধর, আমি মাথার দিক ধরছি।'

কাঠের দুই দিক ধরামাত্রই কাঠ একহাত পরিমাণ বড় হয়ে গেল। জনগণ বলতে লাগলেন, 'ধন্য সেক! এমন ঘটনা চোখেও দেখি নি, কানেও শুনি নি! এমন কখনো ঘটে যে শুকনো কাঠ বড় হয়ে যায়! অন্য মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলব!'

দানব নিধন

মসজিদ তৈরি হতে লাগল। এভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন রাজা সেকের সঙ্গে রয়েছেন। এমন সময় এক দূত এসে প্রণাম জানিয়ে রাজাকে বলল, 'হে মহারাজাধিরাজ, আপনাকে বন্দনা করি। ছাগ ও মানবের রূপধারী পুলক নামক দানব প্রতিদিন

ছাগল, মানুষ প্রভৃতিকে কোন না কোন ছলে পথের মাঝে আটক করে ভক্ষণ করছে। তার ফলে দেশের লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে। মহারাজের পদযুগে একথা নিবেদন করলাম।'

রাজা তাকে বললেন, 'এই দানবের সঙ্গে বিবাদ করি কোন্ যুক্তিতে। সে যা খুশী করুক, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি?'

একথা শুনে সেক বললেন, 'মহারাজ শুনুন, যদি রাজ্যমধ্যে প্রজাদের জীবনে দুর্বিপাক উপস্থিত হয়, তাহলে রাজার পক্ষে তা দোষাবহ। আগামীকাল আমরা দুজনে সেখানে নিশ্চয় যাব।'

এরূপ ঠিক হলে রাজা সেই রাত্রি অতিবাহিত করে পরদিন সকালবেলা অমাত্য, সেক ও মদনকে সঙ্গে করে পূর্বোক্ত স্থানে পৌঁছালেন। রাজার চর সংবাদ জানাল যে দানব ছাগের রূপ ধারণ করে পথে অপেক্ষা করছে। রাজা সেককে দেখালেন। সেক মদনকে বললেন, 'ওহে মদন, আজ তুমি ছয় কড়ির মূল্য পরিশোধ কর।'

মদন সেকের কথায় সম্মত হয়ে বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনিও দেখুন, আমি সেই কামরূপী দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'—এই বলে মদন দানবের সম্মুখে হাজির হলেন।

তারপর পুলক নামক দানব নানান বিকৃত রূপ দেখাতে লাগল। মদন ও দানব উভয়েই গাছের ডাল ভেঙে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন না। ব্যাপার বুঝে সেক স্বয়ং মদনের হাতে আশা-লগুড় দান করলেন এবং তাই দেখে দানব পুলক ছুটে পালাতে লাগল। মদনও তার পিছনে ছুটলেন। অরণ্যের মধ্যে এক মায়া-বিবর ছিল, দানব তার ভিতর প্রবেশ করল। এই অবস্থা দেখে সেক বললেন, 'সকলে মিলে এই গর্ত পাথর দিয়ে বন্ধ করে দাও।'

সেকের আশালগুড়ের দ্বারা বিতাড়িত দানব সেই গর্তের তলদেশে আশ্রয় নিল। সকলে সেকের জয়ধ্বনি দিলেন। পথের অমঙ্গল দূর হল। বনের মায়া-বিবর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা হল।

রাজা সেককে বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনি পথের দানবকে পাতালে বিতাড়িত করলেন। আপনি ছাড়া কে তাকে দমন করতে পারত? আজ আমি এই দেশ ও এই অরণ্য আপনাকে দান করলাম। এর পর কি আজ্ঞা হয় বলুন। এই বন আপনারই অধীন রইল।'

জনগণ বলাবলি করতে লাগলেন, 'সেক দেশের দানবকে পাতালে পাঠালেন। ইনি সাক্ষাৎ দেবতা।'

সেক স্বয়ং সেই স্থানের নাম রাখলেন দেবতল এবং লোক-জনদের আনিয়ে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করালেন।

ধন্য দেশ, ধন্য প্রজা, ধন্য রাজার নন্দন।
সেক-সমাগমে হল সর্ব বিঘ্ন বিতাড়ন।

অতঃপর সেক পুনরায় পাণ্ডুদেশে ফিরে এলেন।

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে অশুভনাশ নামক কাহিনী সমাপ্ত।

আঠার

সুসময় সমাগত। প্রজারা স্বেচ্ছামত দেশে বিদেশে যাতায়াত করতে লাগলেন। মহাত্মা সেকের প্রভাবে কারো কোন বিপদ-আপদ নেই। সেকের দর্শনলাভের আশায় বহু লোকের আগমন ঘটল—নবপ্রসূতি, বালক সকলেই সেকের গন্তব্য স্থানে ভীড় করলেন।

দুই সতীনের ঘর

একদিন এক গৃহস্থ দুই স্ত্রীকে সঙ্গে করে সেকের কাছে এলেন। তার গর্ভবতী যুবতী স্ত্রীর গর্ভধারণের ষোল মাস পরেও প্রসব হচ্ছে না, কারণ তার সপত্নী তুকতাক করেছে।

যে স্ত্রীটি তুক করেছেন, তিনি সেককে বললেন, 'হে মহাত্মা, ইনি আমার সতীন। আমি নিজে পুত্রহীনা, কিন্তু আমার সতীনেরও যথাসময়ে সন্তান হচ্ছে না। এই কারণে আমার হৃদয়ে বড় দুঃখ। আমার সতীনের ছেলে হলেই আমি পুত্রবতী হতে পারব। এইটুকু আপনার শ্রীচরণে নিবেদন। আপনি অনুগ্রহ করুন, আমার সতীনের যেন নির্বিঘ্নে প্রসব হয়। আপনি বর দিন—আমার সতীন যেন ছেলের মা হয়।'

সেক রোদনকারিণী সেই নারীর সমস্ত কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি তার কোন কথাই ভাল মনে গ্রহণ করলেন না। তিনি গোপনে রাজাকে বললেন, 'এই স্ত্রীলোকটি বশীকরণ জানে। কিন্তু সে আমাদের কাছে মিথ্যা ছল করে সতীনের প্রশংসা করছে। এখন কি করা যায়?'

রাজা বললেন, 'এর নাক-কান কেটে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

সেক পুনরায় রাজাকে বললেন, 'বহু লোক এই বলে আমার গুণগান করে যে আমি সবজান্তা। একে শাস্তি দিলে লোকে আমার মহত্বে সন্দেহ করবে। তাই শাস্ত্রে বলে—নারী এবং রাজকুল এই দুইয়ের চিন্তাও পরিহার করা উচিত। স্ত্রী এবং রাজা নিত্য নতুনের অভিলাষী হয়, যেমন গাভী সর্বদা নতুন নতুন তৃণভূমির সন্ধান করে।'

তারপর সেক গৃহস্বামীকে বললেন, 'এই স্ত্রীলোকটি সতীনের দৃষ্টি পেলে সন্তান প্রসব করতে সক্ষম হবে না। তাই দুই সতীনের একত্র বাস করা উচিত নয়। তাছাড়া এই ব্যাপারে আপনিই দোষী, কারণ—দারিদ্র্য, একাধিক স্ত্রী, পথিপার্শ্বের জমিতে চাষ, জামিন এবং সাক্ষী—এই পাঁচটি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত অনর্থ।'

একথা শুনে সেই সতীন সেককে প্রণাম করে বললেন, 'মহাত্মা, যে দিন আমার সতীনের নির্বিঘ্ন প্রসব হবে, আমি সেই দিনই তার কাছ থেকে দূরে চলে যাব।'

সেক বললেন, 'আজই যাও।' সেকের কথামত তৎক্ষণাৎ সেই সতীন বিদায় নিল। কিছুদিন পর সেই গৃহস্বামীকে ডেকে সেক বললেন, 'ওহে, তুমি কিছু বোঝ না। যদি নিজের ভাল চাও তাহলে দুই স্ত্রীকে একত্র রেখ না। আর যদি রাখ তাহলে কোন কিছুতেই তোমার মঙ্গল হবে না। এখন তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী যেখানে খুশী যাক।'

সতীন বিদায় নিলে রাজা সেককে বললেন, 'হে মহাত্মা, এমন স্ত্রীলোকের শাস্তি হওয়া উচিত। তাহলে আপনি আমাকে শাস্তি-দানে বাধা দিচ্ছেন কেন?'

তখন সেক রাজাকে বললেন, 'স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, তাই বোঝা খুব কঠিন। লোকে বলে বহু পাপের ফলে নারীজন্ম হয়। পুরুষ

নারীর মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়, স্ত্রী ব্যতীত তার জীবনধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং নারীকে আমাদের গ্রহণ করতেই হয়।'

মসজিদ তৈরির কাজে আরও কয়েকদিন কাটল। তারপর মসজিদ নির্মাণ হলে সেক রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমি প্রত্যহ এই মসজিদ থেকে পঞ্চাশ মুদ্রা রাজা, ভিক্ষুক প্রভৃতি সবার মধ্যে বিতরণ করতে চাই। আপনি স্বয়ং আমাকে সেই পরিমাণ মুদ্রা খয়রাত করবেন।'

রাজা বললেন, 'আপনার আজ্ঞামত আমি নিত্য পঞ্চাশ মুদ্রা বিতরণ করব।'

কিন্তু সেক রাজার কথায় অভিনন্দন করলেন না। তিনি বললেন, 'মহারাজ আমি দীন জনের মতো বলছি না যে আমাকে দান করুন।'

রাজা পুনরায় তাকে বললেন, 'বর্তমানে আপনার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। আপনি টাকাকড়ি কোথায় পাবেন?'

রাজার কথা শুনে সেক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তিনি নিজের হাত থেকে সেই মণি বের করে রাজাকে দেখালেন। রাজা বারংবার মণির প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে মহাত্মা, কোথায় ঐ মণি সংগ্রহ করেছেন আমায় বলুন। এরূপ একটি মণি এক সন্ন্যাসী আপনার সম্মুখেই আমাকে দান করেছিলেন। কিন্তু আমি যখন গঙ্গাস্নান করছিলাম, তখন বাজপাখির দ্বারা আমার মণি অপহৃত হয়।'

সেক রাজাকে আদেশ করলেন, 'কোন এক স্যাকরাকে ডেকে এই মণির দাম নির্ধারণ করুন।'

রাজা স্যাকরাকে ডেকে দরদস্তুর করে মণির দাম ঠিক করলেন।

স্যাকরা বলল, 'এই মণির দাম আঠার লক্ষ মুদ্রা।'

দাম শুনে রাজা মুখ নীচু করলেন। সেক বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমার মণি গ্রহণ করুন।'

রাজা চিন্তা করে বললেন, 'হে মহাত্মা, এই মুহূর্তে আমার কাছে এত টাকা নেই। একদিন চিন্তা করার সময় দিন, তারপর আপনাকে জানাব।'

তারপর সেক রাজাকে মণিটি দান করলেন। ঠিক সেই সময় এক চর এসে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ, অবনতমস্তকে আপনার পদযুগে বন্দনা করে নিবেদন করি নন্দী নামে এক ক্ষেত্রপাল প্রতিদিন মানুষ ধরে খেয়ে ফেলছে।'

কিন্তু রাজা যেন তার কথা শুনেও শুনলেন না। সেক তাঁকে বললেন, 'রাজ্যের এমন অমঙ্গলের কথা শুনেও আপনি চুপ করে আছেন কেন? প্রস্তুত হোন, আমার সঙ্গে চলুন।'

অমাত্যকে সঙ্গে করে সেক ও রাজা ক্ষেত্রপালের সম্মুখে পৌঁছালেন। মদন ও ক্ষেত্রপাল নন্দীর ভয়ানক যুদ্ধ হল। কিন্তু কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারল না। ব্যাপার দেখে সেক ক্রোধভরে দানবরাজ নন্দীর দিকে তাকালেন, তৎক্ষণাৎ সে ভস্ম হয়ে গেল। কিন্তু এই আশ্চর্য ব্যাপার কেউ চোখে দেখল, কেউ দেখতে পেল না। কেউ বলল দানব পালিয়েছে, কেউ বলল লুকিয়ে পড়েছে। এরূপ আলোচনা করতে করতে প্রজারা নিজ নিজ স্থানে ফিরলেন। দেশ বিপদ্মুক্ত হল। তারপর রাজা সেই স্থানটি সেকের উদ্দেশ্যে দান করলেন। সেক স্বয়ং তার নামকরণ করলেন নান্দোবাপুর।

রাজা গৃহে ফিরে পত্নীকে সেই মণি দেখালেন। রাজরানী দেখেই মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'মহারাজ, বণিক তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে যে এই মণি এত মূল্যবান। আঠার লক্ষ টাকা আমরা কোথায় পাব!' তিনি আরও বললেন, 'তুমি খুব বোকা; এই মণি লাভ করার জন্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করলেই পারতে। তারপর সেক যা আদেশ করতেন তাই পালন করতে।'

তারপর রাজরানী স্বয়ং সেকের কাছে হাজির হয়ে তাকে

অবনতমস্তকে বললেন, 'হে মহাত্মা আপনার দেওয়া কাঁকন আমি হাতে পরেছি আর কুণ্ডলছুটি পুত্রকে পরতে দিয়েছি। এখন আমি আপনার আঠার লক্ষ টাকার মণি হাতে পরেছি। ঐ টাকায় কি কাজ সম্পাদন করতে হবে আদেশ করুন, নতুবা আপনার প্রদত্ত মণি হাত থেকে খুলে আপনাকে ফিরিয়ে দিই।'

সেক তাকে বললেন, 'রাজরানী, মণি হাত থেকে খুলে ফেলছেন কেন? মণির টাকায় আমি আপনাদের গ্রামগঞ্জ ক্রয় করব।'

রাজরানী বল্লভা পুনরায় সেককে বললেন, 'হে মহাত্মা, রাজ-দম্পতি আপনাকে প্রীত করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা-জমি বিলি করবেন। নতুবা আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের জমিজমা গ্রহণ করুন।'

সেক হাসিমুখে রাজরানীকে প্রাসাদে ফেরৎ পাঠাবার জন্য বললেন, 'আপনার কথা চিন্তা করে আগামীকাল উত্তর জানাব। আপনি রাজা ও মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা আলোচনা করুন।'

রাজরানী বললেন, 'হে মহাত্মা, মন্ত্রী স্বয়ং দুষ্ট, তিনি আপনার বিরোধী। তিনি আমার ভাইয়ের নামে কুকীর্তি রটিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। রাজা আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল-বাসেন। হে মহাজ্ঞানী, আপনি ইচ্ছামত গ্রামদেশ গ্রহণ করুন। আমি দান করছি। রাজা অথবা মন্ত্রী আপত্তি করবেন কেন? রাজ্যই আপনাকে দান করা উচিত। যার অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পায়, তাঁকে সামান্য গ্রাম দান করা তো তুচ্ছ ব্যাপার। সমগ্র রাজ্য আপনার কৃপায় সোনার কঙ্কণ, কুণ্ডল প্রভৃতিতে পূর্ণ হল।'

সেক রাজরানীর প্রশংসা করে বললেন, 'সাধু, সাধু, আপনি যথার্থ বলেছেন।' এই বলে সেক বল্লভাকে গৃহে পাঠালেন। তারপর তিনি রাজার গ্রামগঞ্জের খবরাখবর সংগ্রহ করলেন। তিনি বুঝলেন রাজার সমস্ত রাজ্য ও ধনসম্পদেও তাঁর রত্নের

তুল্যমূল্য হবে না। তিনি পুনরায় রাজার সমস্ত ভূসম্পত্তির সংবাদ নিলেন। দেবতল নামক স্থানে বাসস্থান নির্মিত হল এবং দেবতলই সেক-গ্রামের শ্রেষ্ঠ স্থানরূপে নির্বাচিত হল। বরেন্দ্র-ভূমিতে নান্দোবাপুর সেকের কৃপায় উৎকৃষ্ট রমণীয় স্থানে পরিণত হল। পরদিন সেক রাজাকে বললেন, 'আঠার হাজার গ্রাম-সমন্বিত দেশ আমাকে দান করুন।'

রাজা বললেন, 'আপনি স্বেচ্ছামত গ্রামদেশ গ্রহণ করুন।'

দেবতল গৃহীত হল, তার সঙ্গে নান্দোবা, আশমান হাট, উত্তরে আরও ছশো গ্রাম, লহুচারি ও রাজাদীন। মহাত্মা সেক গ্রাম নিলেন, পৃথিবী-বিখ্যাত রামাবতী পুরী নিলেন, তারপর পর্বহাট, উত্তরহাট, মদৈহাট। তারপর আরও সব গ্রাম নেওয়া হল। সেগুলির মাপজোক করা হল। বাইশটি গ্রামের খাজনা-পত্র তৈরি হল। গ্রামগুলির মালিকানা গ্রহণ করে সেক রাজাকে জানালেন। রাজা স্বহস্তে দানপত্র লিখে দিলেন এবং বললেন, 'যা যা করতে হবে, তাই করুন।'

সেক সকলকে ডেকে দলিলপত্র তৈরি করলেন। তারপর তিনি মদনকে নগদ পঞ্চাশ মুদ্রা দান করলেন। ভিক্ষুক, দরিদ্র ও ধনী সকলের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে বিলিবন্দোবস্ত করলেন; খাতক ও অতিথিদের মধ্যেও দান গ্রহণের নিয়ম তৈরি করা হল। সেক জন-গণের মধ্যে ধনসম্পদ দানখয়রাতির বিধিবিধান নির্ধারণ করলেন। অন্ত্যজ শ্রেণী ও বাহক সকলেই তাঁর দান গ্রহণের যোগ্য হল। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দূর হল, সর্বদা ভিক্ষা সুলভ হল। ঠিক হল প্রত্যেকে উদরান্ন পাবে, কিন্তু অতিরিক্ত সঞ্চয় করা চলবে না।

সেক আরও বললেন, 'শ্রেষ্ঠ রাজারা আমার কথা মান্য করুন, তাহলে তাঁরা বিজয়ী হবেন, তাঁদের কখনো পরাজয় ঘটবে না।'

হলায়ুধমিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মহাসদন-দেশক্রয় নামক কাহিনী সমাপ্ত।

উনিশ

পরদিন শুভ প্রভাতে সকলে এক সভায় মিলিত হলেন। সভা পূর্ণিমার চাঁদের মত শোভা পেতে লাগল। গাঙ্গো নট সভায় হাজির হয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে নৃপশ্রেষ্ঠ, উপস্থিত সকলের মধ্যে সর্বপ্রথম কাকে প্রণাম জানাই?'

তিনি জোড়হাতে বললেন, 'মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এখানে সমাগত; তাই হে বিপ্রগণ, বলুন প্রথমে কার উদ্দেশে প্রণাম জানাব।'

কেউ বললেন রাজাকে প্রণাম করুন, কেউ বললেন সেককে, কেউ বললেন সন্ন্যাসীকে, কেউ বা বললেন ব্রাহ্মণদের। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হল না।

সেক হলায়ুধ মিশ্রকে বললেন, 'আপনিও তো শাস্ত্রজ্ঞ। সুতরাং নিশ্চিত করে বলুন সর্বাগ্রে কাকে প্রণাম করা উচিত। শুধু বললেই সমাধান হয় না, সাক্ষাৎ ব্যবহারে তা দেখতে চাই।'

হলায়ুধ মিশ্র বললেন, হে মহাত্মা, আপনার প্রশ্নের উত্তর বলতে পারি। অধিকন্তু তার সপক্ষে শাস্ত্রের প্রমাণও আলোচনা করতে পারি, যদি কেউ ক্রুদ্ধ না হন।'

সেক বললেন, 'আমি উপস্থিত থাকতে কার এমন শক্তি যে ক্রোধ প্রকাশ করেন?'

তখন হলায়ুধ মিশ্র জানালেন, 'আপনি হাজির থাকতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নমস্কার করা উচিত হবে না; সর্বাগ্রে আপনাকে নমস্কার করাই যুক্তিযুক্ত।'

সকলে বললেন, 'তাই হোক।' কিন্তু সন্ন্যাসী সে কথায় সম্মত হলেন না।

সেক হলায়ুধ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সর্বাগ্রে যোগীকে নমস্কার করা উচিত নয় কেন? এই সন্ন্যাসী সাতশো বছর মাটির তলায় তপস্যা করেছেন। এঁর মহত্ত্ব স্বীকার করছেন না কেন?'

যোগী বলে উঠলেন, 'তার কারণ ব্রাহ্মণরা আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। সেই হেতু আমার সঙ্গে তাদের কোন ভালোবাসা নেই।'

হলায়ুধ মিশ্র যোগীর নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, 'তাহলে শুনুন, মহাত্মা সেকও শুনুন, যেহেতু যোগী পিতামাতার দ্বারা বহিষ্কৃত, সেই হেতু সর্বাগ্রে তাঁকে নমস্কার করার নিয়ম ঠিক নয়। শাস্ত্রে বলে—সন্ন্যাসী বা যোগীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেও নরকে যেতে হয়। তা ছাড়া ইনি যে সাতশো বছর মাটির তলায় বেঁচে ছিলেন তাতেও কিছু মহত্ত্ব নেই। যে মানুষ এই পৃথিবীতে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, দেখাশুনা করে দীর্ঘজীবী হন, তিনিই মহৎ ব্যক্তি। শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ আছে। কিন্তু কোন্ রাজার রাজসভায় যোগী আছে? যার সঙ্গে আলাপ করলে মহাপাতক, তেমন ব্যক্তি এখানে থাকবেন কেন? আগামী কাল থেকেই আমি আর এই সভায় আসব না।'

সেক হলায়ুধ মিশ্রকে নিবৃত্ত করলেন। যোগী বিমনা হয়ে রইলেন। তিনি মিশ্রকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার চিরকালের শত্রুতা।'

তখন ভাদ্রমাস। গ্রামের স্ত্রীলোকরা হাতে মালসা, সরা, ভাজা প্রভৃতি নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন স্ত্রীলোক ছিল ডাকিনী। সকলে গান গাইতে গাইতে

পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুষ্টা স্ত্রীলোক দুজনে রাজসভায় সেক ও যোগীকে দেখল। তাদের মধ্যে একজন যোগীর কানে কুণ্ডল দেখে তার মন্ত্র নিক্ষেপ করল, দ্বিতীয় জন সেকের আশালগুড়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র নিক্ষেপ করলে। সেকের আশালগুড়ে টিড়া নামে একটি পোকা বসেছিল; মন্ত্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পোকাটি বুক ফেটে মাটিতে পড়ল কিন্তু কচি ঘাসের উপর শিশিরের মধ্যে পড়ে পোকাটি কোন মতে বেঁচে গেল। অন্যদিকে যোগীর কুণ্ডলদুটি ভগ্ন অবস্থায় কিছুদূরে পতিত হল। সেক পোকার অবস্থা দেখে বুঝলেন কোন ডাকিনীর এমন কাজ। এদিকে স্ত্রীলোকেরা সকলে গঙ্গায় পৌঁছালেন। খবর পেয়ে সেক অনুচর মদনকে ডেকে বললেন, 'আমার আজ্ঞামত এই আশালগুড় সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার পথে যাও এবং পথের মধ্যে সবার অজ্ঞাতে ধুলোর উপর দাগ টেনে রাখবে।'

মদন সেকের আদেশমতো কাজ করল। স্ত্রীলোকেরা গঙ্গায় ব্রত সমাপন করে সেই পথে ঘরে ফিরছিলেন। সেই দুই দুষ্টা ডাকিনী গান গাইতে গাইতে পথ হাঁটছিলেন। তারা দেখতে পেল পথের মাঝে আকাশ পর্যন্ত উঁচু লোহার শিকল। তাই তারা সেই পথ পার হয়ে এগিয়ে যেতে পারল না। ব্যাপার দেখে তারা ছল করে সেকের অভ্যর্থনা করতে ভাটিয়ালী রাগে গান ধরল—

হও যুবতী পতিয়ে হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইয়ে দিন॥
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ॥
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগরমধ্যে লোহার গড়॥ ধ্রু
হাত যোড় করিয়া মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান॥

বড় সে বিপাক আছে উপায়।
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়॥
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান।
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ॥
শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহে অনল॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে আর।
প্রাণ যায় বহিঞাঁ ভার॥
নয়ন বহিয়া পড়ে নীর।
জীয়ে ন প্রাণী পলায়ে ন বীর॥

তাদের মুখে কপট প্রশংসা শুনে সেক হুংকার ছাড়লেন। তারা দুজনে পুনরায় গাইতে লাগল—

আশপাশে শ্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা।
চল যাই সখি পলাইল শঙ্কা॥

ডাকিনী স্ত্রীলোকেরা এরূপ গান গাইতে গাইতে বিদায় নিল।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে ডাকিনী-প্রয়োগ সমাপ্ত।

কুড়ি

রাত্রিতে যোগী নিজের আবাসে ফিরে এলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, 'এরপর কি করা যায়! যে দেশে সম্মান নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, অথবা বিত্তা অর্জনের সুযোগ নেই, সেই দেশে বাস করা উচিত নয়।'

যোগী রাত্রিতে অন্তর্ধান করলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা সেক-সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'সেই যোগী কোথায়? তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। হে সেক, যদি কৃপা করেন, তাহলে জিজ্ঞাসা করি কোন্ কর্মের জন্য আপনি যোগীকে ত্যাগ করলেন? আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় আপনি একাকী আছেন; হলায়ুধ মিশ্রের প্রতি আপনার এত স্নেহ কেন? হে তপোধন, আপনি সজ্জনের শাস্ত্র সম্যক জানেন। আপনি কোন্ কোন্ দেশ পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যে ভ্রমণ করেছেন? এসব কথা আপনার মুখে শুনতে চাই, যদি দয়া হয় তবে বলুন।'

সেক সহাস্যে রাজাকে বললেন, 'হে নৃপনন্দন, আমি সব কথা সংক্ষেপে বলছি, শুনুন—ভ্রমণ করতে করতে একদা মওদা রাজ্যে উপস্থিত হলাম। সেখানে ক্ষত্রিয় রাজা প্রতাপমল্ল রাজত্ব করতেন। তাঁর পত্নীর নাম সোমপ্রভা। রাজা ও রাজপত্নী প্রতিদিন রাজ-সভায় সাতাশ জন ব্রাহ্মণকে সংবর্ধনা জানাতেন। একদিন জ্ঞানপাগল নামে এক যোগী রাজার নিকট হাজির হলেন। তিনি রাজাকে নানান আশীর্বাদ করে বললেন, 'মহারাজ, আমি নানা দেশ ঘুরে এখানে পৌঁচেছি। আপনি অনুগ্রহ করলে আমি চার মাস এখানে বাস করতে চাই।'

রাজা যোগীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললেন 'আপনি ইচ্ছামত এ রাজ্যে থাকুন। আমি আপনাকেও সংবর্ধনা জানাই, কোন অন্যথা হবে না।'

যোগী রাজার নিকট পানভোজনের উপকরণ লাভ করলেন। এইভাবে দিন যায়। কিন্তু রাজসভায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগীর বিরোধ বাড়তেই লাগল। ব্রাহ্মণরা অভিযোগ করলেন, মহারাজ, নীচ ব্যক্তির সঙ্গে আপনার সম্ভাষণ যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাচীন শাস্ত্রেই বলেছে—যোগীদের সঙ্গে সম্ভাষণ করলেও নরকে গতি হয়। যোগীরা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে বলে, 'মহারাজ, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যা দান করেন, তার ফল পান কোথায়? অধিকন্তু সেই দ্রব্যাদি লাভই ব্রাহ্মণদের জীবন ধারণের উপায়। যদি মরা গাছে জল দিলে গাছ বেঁচে উঠে, তাহলে বুঝবেন আপনার সভাসদ ব্রাহ্মণরা যা বলেন, তা সত্য; নতুবা তাদের সব কথাই মিথ্যা।'

দুর্ভাগ্যবশে রাজা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করতে লাগলেন। তাই দেখে রাজপত্নী সোমপ্রভা স্বামীকে বোঝালেন, 'মহারাজ শুনুন, মান্ধাতা প্রভৃতি সমস্ত নৃপতিরাই ব্রাহ্মণদের পূজা করতেন। আরও শুনুন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে অষ্টাশি হাজার গৃহী স্নাতক ব্রাহ্মণ বাস করতেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ত্রিশ জন দাসীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতেন। সেই তুলনায় আমরা হতভাগ্য; আমরা ব্রাহ্মণদের জন্য কিই বা দান করতে পারি!'

কিন্তু রাজা স্ত্রীর কথা মানলেন না। সোমপ্রভা আপন বুদ্ধিমতো ব্রাহ্মণদের সংবর্ধনা করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুকাল কাটল। একদিন রাজা প্রতাপমল্ল সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে এসে স্নান শেষ করে নিত্যকর্ম আচরণ করছিলেন। রাজপত্নী সোমপ্রভা পূর্বেই এসেছেন। পূজার অনুষ্ঠানাদি সমাপনের পর রাজা অশ্বারোহণে ঘরে ফিরছেন। পথে তাঁর মাথার উষ্ণীষ অজ্ঞাতে খুলে পড়ে গেল। এক যোগী

সেটি কুড়িয়ে পেলেন। রাজপুরুষরা ভয়ে সেকথা রাজাকে জানাতে পারল না। ঘরে ফেরার পর রাজপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ আপনার মাথার পাগড়ি তো দেখছি না।'

রাজা মাথা নাড়িয়ে দেখলেন, পাগড়ি খুঁজে পেলেন না। তিনি বললেন, 'প্রিয়তমে, পাগড়ি কোথায় পড়ল তা জানি না।'

রাজপত্নী হাসতে হাসতে বললেন, 'মহারাজ, আপনার জ্ঞানই নেই পাগড়ি কোথায় পড়ল। ভাগ্যবলে আমি আপনার কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। নতুবা কেউ যদি আমাকেও নিয়ে পালিয়ে যেত, আপনি জানতেই পারতেন না।'

স্ত্রীর কথায় রাজা লজ্জা পেলেন। তিনি পুনরায় গঙ্গাতীরে ফিরে এসে সকলকে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু যোগী, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্যরা সকলেই বললেন কেউই পাগড়ি পান নি। রাজা বিমনা হয়ে ঘরে ফিরলেন। তারপর তিনি যথানিয়মে গ্রামে গ্রামে দূত পাঠালেন; ঘোষণা করা হল যে ব্যক্তি রাজার পাগড়ি ফিরিয়ে দেবেন, তিনি অনেক ধনসম্পদ পুরস্কার পাবেন। কিন্তু কোন লোকই জানাল না যে রাজার পাগড়ি তিনি পেয়েছেন। অন্যদিকে রাজা স্ত্রীর বাক্য চিন্তা করতে করতে কিছুদিন কাটালেন।

তারপর কোন একদিন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী জনৈক যোগী এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মহারাজাধিরাজ, আপনার অবগতির জন্য জানাই—আজ আমি ভিক্ষা আদায় করে নদীতীরে এসে যখন পৌঁছালাম, তখন সেখানে এক রজস্বলা ব্রাহ্মণী নদীতে স্নান সেরে তার মাসিকের বস্ত্র রৌদ্রে শুকাতে দিয়েছিল। তারপর ব্রাহ্মণী সেটি ভুলবশত সেখানেই রেখে বাড়ি ফিরে যান। আমি সেই বস্ত্রখণ্ড লাভ করে মহারাজের কাছে নিবেদন করলাম। এখন আপনি এই বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করুন এবং তারপর আপনার যা অভিলাষ তাই করুন।'

রাজা বুঝলেন এই বস্ত্রখণ্ড তাঁর পাগড়ির কাপড় থেকে তৈরি। তাই জেনে ক্রুদ্ধ রাজা হাজির হলেন সেখানে যেখানে ব্রাহ্মণদের বাস। রাজপত্নী সোমপ্রভাও তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। ব্রাহ্মণদের ডেকে রাজা বললেন, 'বিপ্রগণ, যদি নিজেদের মঙ্গল চান, তাহলে আমার পাগড়ি ফিরিয়ে দিন।'

রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। পাগড়ির খোঁজ করে যখন তারা তা পেলেন না, তখন সকলে হতবাক হয়ে রইলেন। তারপর তাঁরা বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছেন কেন ? আপনার পাগড়ি আমরা দেখিনি এবং আমাদের মধ্যে কেউ পেয়েছেন, তাও শুনি নি।'

তখন রাজা রাজকর্মচারীদের আদেশ দিলেন, 'তোমরা সব ব্রাহ্মণদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে খোঁজ নাও।'

কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নানান উপায়ে অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কোথাও পাগড়ির খোঁজ পেলেন না। তারপর রাজা ধাত্রীকে পাঠালেন। ধাত্রী ব্রাহ্মণীদের বিবস্ত্রা করে অনুসন্ধান করলেন। তবুও সেই পাগড়ির সন্ধান মিলল না।

অতঃপর রানী সোমপ্রভা স্বামীকে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'মহারাজ, ধর্মকে পরিত্যাগ করবেন না। আপনি যা করছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়।'

রাজা তাকে তর্জন করে বললেন, 'পাপীয়সী, তুমি কি সেই যোগীর মুখ থেকে যথাযথ ঘটনা শুনেছ!'

রানী পুনরায় বললেন, যে যাদবগণ কংসের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কৃষ্ণের বাক্য মান্য করা তাঁদের উচিত ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আহত করেছিলেন, অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং কটু বাক্য বলেছিলেন, তবু ব্রাহ্মণরা সর্বদা নমস্য। সেই কারণেই ব্রাহ্মণরা সকলের পূজ্য।'

কিন্তু রাজার দুর্ব্যবহারে সভাসদ্ ব্রাহ্মণরা নিজেরাই নিজেদের অবজ্ঞা করতে লাগলেন—'ধিক আমাদের। আমরা জীবিত হয়েও মৃতের ন্যায় বেঁচে আছি, সকলের অবজ্ঞার পাত্র হয়ে গেছি। আমাদের মৃত্যুই ভাল, অথবা এই দেশ পরিত্যাগ করা উচিত।' —এইরূপে সমস্ত ব্রাহ্মণরা রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। তারা রাজার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ রটালেন, তাই আপনি অল্পায়ু হবেন। যদি আমরা পবিত্র ও নিরপরাধ হই, তবে অচিরেই আপনার উপর বজ্রপাত হবে। আপনার রাজ্য দগ্ধ হবে।' এই বলে তাঁরা দেশত্যাগ করলেন। সোমপ্রভা বহু দুঃখ করলেন। কারণ যে দেশে মানুষের আত্ম-সম্মান বজায় থাকে না, বন্ধুবান্ধব থাকে না, অথবা বিদ্যা অর্জনের সুযোগ থাকে না সে দেশে বাস করা বিধেয় নয়।

রাজপত্নী স্বামীকে বললেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণদের অভিশাপ অবশ্যই ফলবে।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই তো হল না।'

রাজপত্নী বললেন, 'যে কর্মের ফল অনুপভুক্ত, তা শতকোটি যুগের মধ্যে কোন না কোন সময় ভোগ করতে হবে। শুভ অথবা অশুভ কর্মফল কর্তার দ্বারা অবশ্য ভোগ্য হয়।'

স্ত্রীর কথায় রাজা ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত অভিশাপ বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হলেন। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি আবার বলছি যে ব্যক্তি আমার পাগড় ফিরিয়ে দেবেন, আমি তাকে লক্ষ মুদ্রা দান করব। আমার এ কথার কোন অন্যথা হবে না।'

রাজার ঘোষণা শুনে লক্ষ মুদ্রার লোভে সেই যোগী রাজার পাগড়ি নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার পাগড়ি আমার আশ্রমের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি, আপনি এটি গ্রহণ করুন। এবং নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন।'

রাজা বললেন, 'তাই হবে। যোগীদের মঙ্গল হোক।'

রাজা পাগড়ি ফিরে পেলেন। তারপর তিনি সুগন্ধি তেল সংগ্রহ করে রাজ্যের সন্ন্যাসীদের ডেকে বললেন, 'আপনারা সকলে কুৎসিত পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করুন। আমার ভাণ্ডার থেকে উত্তম বস্ত্র সংগ্রহ করে পরিধান করবেন। এখন সকলে স্নান করে আসুন।'

একথা শুনে সন্ন্যাসীরা মলিন বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে সুগন্ধি তেল মেখে স্নান সারলেন। তখন রাজা সেককে আদেশ দিলেন, 'সন্ন্যাসীদের পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করুন।'

বস্ত্রগুলি সংগ্রহের পর সেগুলি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হল। সেগুলি দগ্ধ হওয়া মাত্রই অনেক ধনরত্ন আবির্ভূত হল। তারপর সমস্ত সন্ন্যাসীদের কর্ণ ও নাসিকা কর্তন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হল।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র নগরী দগ্ধ হল। রাজা বজ্রাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেন। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে রাজ্য দগ্ধ হল দেখে আমি দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করলাম।"

হলায়ুধমিশ্র বিরচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের বিংশতি পরিচ্ছেদে দিগ্বিজয় কাহিনী সমাপ্ত।

একুশ

তারপর একদা প্রাতঃকালে আমি (সেক) কোলাঞ্চ দেশে উপস্থিত হলাম। সেই দেশে জয়প্রতাপ নামে রাজা বাস করতেন। তাঁর রাজ্যে সেকবরকত নামে এক মহাধনী ছিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে পৌঁছালাম। বরকত আমাদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করলেন। বিবিধ মধুর আলাপে রাত্রি কাটল।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওহে সেকবরকত, এই রাজ্যে তো তোমাদের মহারাজা আছেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কিরূপ ?'

বরকত বললেন, 'সেক, তাঁর মাহাত্ম্যের কথা কি বলব! তাঁর গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। রাজা জয়প্রতাপ রাজ্যকে চারভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক ভাবে সকলের মধ্যে দান করেছেন। এক ভাগ ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধর্মের নামে প্রদত্ত ; এক ভাগ রাজার ভরণপোষণের জন্য নির্ধারিত ; এক ভাগ সেকদের জন্য প্রদত্ত এবং আর এক ভাগ সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য প্রদত্ত। জয়প্রতাপের রাজ্যে পূর্ণস্রোতা গঙ্গা বয়ে চলেছে। গঙ্গাতীরের এক প্রাসাদে বাস করেন রাজরানী কমলসেনী ; নিত্য ভোগসুখের আনন্দে তার দিন কাটে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রানী ভিক্ষুক ও দরিদ্র প্রজাদের ভোজন করান। একদিনের জন্য আপনি সেখানে হাজির হয়ে দেখুন। রাজরানীর গুণপনা অবর্ণনীয়।'

তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'বরকত, তুমিও তো বেশ বিত্তশালী লোক ; মালিকের কৃপায় অনেক ধনসম্পদ ও স্ত্রীপুত্রাদি লাভ করেছ ; তোমার জীবন সফল হয়েছে। সবই আল্লার দয়া।'

কথা শুনে বরকত আমাকে ভর্জন করে বলে উঠলেন, 'ওহে বিদেশী সেক, তুমি আমার দুঃখের কাহিনী জান না। তাহলে শোন—প্রথম জীবনে আমি খুবই গরিব ছিলাম, তবু নিজের ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতাম। অন্নাভাবে বার বছর বনের শাক তুলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাই খেতাম। দুহাত তুলে মালিকের উদ্দেশে বলতাম, আল্লা, আমার দুঃখ ঘোচাও। কিন্তু তাঁর দান অথবা দর্শন মিলত না। কিছুদিন পর মালিকের সংক্ষিপ্ত এক বাণী পেলাম। তিনি আমাকে বলছেন, অচিরেই তুমি মহাজন হবে।'

তখন এই রাজ্যের রাজা জয়প্রতাপ। তাঁর হাতের আঙুলে এক ফোঁড়া হয়েছিল, ফলে তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলেন। শুভঙ্কর নামে এক নাপিত রাজার কাছে গেল। রাজা যন্ত্রণায় কাঁদছেন। নাপিত ছলছুতোয় রাজাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তার সেই আঙুলটি মুখে পুরে দিল। মুখের লালায় ফোঁড়া ফেটে গেল। রাজা আরামে ঘুমোতে লাগলেন। তাই দেখে রাজরানী কমলসেনা লক্ষমুদ্রা মূল্যের হারটি নিজের গলা থেকে খুলে ঐ নাপিতকে দান করলেন।

নাপিত হারটি সংগ্রহ করে খুশীমনে ঘরে ফেরার সময় হাটে মাছ প্রভৃতি কিনে পথে এক পুকুরের পাড়ে জিনিসপত্র নামিয়ে স্নান করতে লাগল। সেই সময় এক চিল নাপিতের মাছের উপর ছোঁ মেরে যখন মাছ তুলে নিল, তখন সেই হারটি চিলের পায়ের নখে আটকে গেল। দৈবযোগে সেই চিল আমার উঠানের আমড়া গাছের উপর এসে বসল এবং হারটি আমার কপালে জুটে গেল। তাই আমি এখন মহাধনী। মালিকের দয়ায় অবস্থা ফিরল তা বলি কেমন করে? মালিক তো আমাকে কানাকড়িও দিলেন না! আমার আমড়া গাছই ধন্য। তাছাড়া আর কি!'

তার কথা শুনে আমি সক্রোধে ভর্জন করতে করতে বললাম,

'পাপিষ্ঠ, তুমি বোক না; সবই আল্লার দয়ায় ঘটল। মালিক ছাড়া আর কার শক্তি আছে যে তোমাকে ধনসম্পদ দান করতে পারে। তবে তুমি তো জান ঐ হারের মালিক হল নাপিত। তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ না কেন? এই জন্যই আমি তোমার নিন্দা করছি। তোমার সেক বরকত নাম বৃথাই। তোমার নাম হওয়া উচিত সেক হরকত, কারণ তুমি পরের ধন হরণ করতে চাও।'

আমার কথা শুনে বরকত চটে গিয়ে বলল, 'আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে গালমন্দ করছ।' এই বলে তিনি চাকরদের আদেশ করলেন, 'এই সেকের হাত ধরে বিতাড়িত কর।'

আমি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে অন্য এক সেক আমাকে বললেন, 'সেকভায়া, কোথায় চলেছেন? সব জায়গায় বাঘের ভয়। আমার মোকামেই থাকুন।'

তার কথায় সেখানেই থাকলাম। রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি বরকতের হারপ্রাপ্তির ঘটনা বললাম। আমার কথা শুনে এই সেক রাত্রিতে বরকতের ঘরে ঢুকে সেই হারটি চুরি করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে চুরি করে পালানোর সময় এক বাঘ তাকে ধরে শিমুল গাছের তলায় টেনে এনে খেয়ে ফেলল।

বরকত ভাবলেন, 'এই বিদেশী সেক আমার হার চুরি করেছে।' তাই তিনি রাজার কাছে নালিশ জানালেন। পেয়াদারা আমাকে ধরে নিয়ে রাজার কাছে হাজির করাল।

বিচারকালে রাজা বরকতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে বরকত, ইনি একজন মহাত্মা শুভলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি চোর এ কেমন কথা?'

রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাত্মা সেক, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? প্রথমে বরকতের অভিযোগের উত্তর দিন।'

আমি রাজাকে উত্তর দিলাম, 'মহারাজ, আমি চোর নই। আমি দেশ দর্শনের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে আমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। আমি হার চুরি করে রাখব কোথায়?'

এমন সময় রাজার দূত এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জানাল, 'মহারাজের পদযুগে নিবেদন করি—এক দুর্ধর্ষ বাঘ কোন এক শিমুল গাছের তলায় একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোককে ধরে খেয়েছে। মহারাজের চরণে এই সংবাদ আমি নিবেদন করলাম।'

খবর শুনেই রাজা জয়প্রতাপ সৈন্যসহযোগে সেই শিমুল গাছ ঘিরে ফেললেন। ফাঁদ পেতে বাঘকে ধরা হল এবং হার উদ্ধার করা গেল। সেই ব্যাপার দেখতে বহু লোকজন জড়ো হয়েছিলেন।

সেক বরকত হার দেখে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই হার আমার।'

কিন্তু রাজা যখন দেখলেন, তিনি বললেন, 'এতো আমার হার। এই হার আমি পূর্বে নাপিতকে দিয়েছিলাম। আপনি কোথা থেকে এটি পেলেন?'

নাপিতকে ডাকা হল। সে বলল, 'মহারাজ, রাজরানী কমলসেনী আমাকে এই হার দান করেছিলেন। আমি পুকুরের ঘাটে সেটি নামিয়ে রেখে স্নান করতে গিয়েছিলাম। হারটি রেখেছিলাম মাছের সঙ্গে। এক চিল ছোঁ মেরে হারটি নিয়ে যায়; তারপর হারটি কোথায় পরিত্যক্ত হয় তা জানি না।'

রাজা বরকতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই হারই তো এটি। কিন্তু বরকত, তুমি কিভাবে এই হার পেলে?'

বরকত আস্পর্ধা দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজ, হার আমার। আপনি নিজের মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন না কেন? আমি যেখানেই পাই কেন, আপনার কি?'

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুরুষদের আদেশ করলেন, 'এই সেক বরকতের শিরশ্ছেদ কর।'

বরকতকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে আমি (সেক) বললাম, 'মহারাজ, ধর্ম ত্যাগ করবেন না। বরকতকে হত্যা করা ঠিক হবে না। তবে সে অন্তের নামে অপবাদ রটায়, তাই তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করুন।'

রাজা জয়প্রতাপ বললেন, 'সেক, শুনুন, বরকত আপনাকে চোরের অপবাদ দিয়েছে এবং মিথ্যা কথা বলে আমার সঙ্গে তর্ক করেছে।'

রাজা পুনরায় হারটি নাপিতকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বরকতকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'আমি যেখানে সেকদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছি, আপনি সেখানে গিয়ে সুখে বসবাস করুন।'—এই কথা বলে রাজা বিদায় নিলেন এবং আমিও সেকেদের মোকামে হাজির হলাম। সেখানে যথাবিধি কিছুদিন কাটল।

কিছুকাল বাস করার পর সেকরা আমাকে বললেন, 'হে মহা-জ্ঞানী, আপনি মহাত্মা ব্যক্তি; আমাদের তত্ত্বকথা উপদেশ করুন।'

আমি তাদের বললাম, 'আপনারা মূর্খ, তাই রাজার দ্বারা প্রদত্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করছেন। আপনাদের কাছে তত্ত্বকথার উপদেশ দিয়ে কি লাভ? তত্ত্বকথার আলোচনা করা সহজ কিন্তু তত্ত্বলাভ করা দুঃসাধ্য। দুর্লভ বিষয় লাভের জন্য এত অভিলাষ কেন?'

আমার কথা শুনে সেকেরা খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা সকলে বললেন, 'সকলে মিলে হাত ধরে টানতে টানতে একে এই মোকাম থেকে দূর করে দাও।'

সকলে আমাকে হাতে ধরে বিতাড়িত করলেন। তারপর যেখানে যোগীরা বাস করতেন, আমি সেখানে হাজির হলাম। প্রধান যোগী জ্ঞাননাথ আমাকে বললেন, 'আপনি ইচ্ছামত আমাদের এখানে বাস করুন।'

কিছুদিন পর জ্ঞাননাথ একদা সমস্ত যোগীদের বললেন, 'আপনারা সকলে শুনুন, এই সেক একজন মহাসাধক। যদি এর মাংস ভক্ষণ করতে পারি তাহলে আমরাও সকলে যোগসিদ্ধ হতে পারব।'

অন্যান্য যোগীরা বললেন, 'তাহলে তার ব্যবস্থা করা হোক।'

রাত্রিবেলা জ্ঞাননাথ কাপড়ে মুখ ঢেকে আমাকে চেপে ধরলেন এবং অন্যান্য যোগীদের বললেন, 'আপনারা দা দিয়ে এই সেককে বধ করুন।'

আমি বুঝলাম এই যোগীরা সকলেই দুরাত্মা। তাঁরা সকলে আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন। তখন আমি স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ করে যোগী জ্ঞাননাথের রূপ ধরলাম। তারপর যোগীরা আমাকে জ্ঞাননাথ ভেবে আসল জ্ঞাননাথকে হত্যা করলেন। সাতজন যোগী তাঁর মাংস ভক্ষণ করলেন, যাঁরা মাংস পেলেন না, তাঁরা হাড়গুলি বেঁটে ভাগ করে খেলেন। প্রাতঃকালে আমি কোন উপায়ে পালিয়ে গিয়ে আচার্য কুশধ্বজের আশ্রমে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে আচার্য বললেন, 'ওহে দরবেশ, কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আচার্য, যোগীদের ভয়ে আমি আপনার এখানে পালিয়ে এসেছি। যোগীরা আমাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল। প্রাণনাশের ভয় থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তারপর অন্য কথা জিজ্ঞাসা করবেন।

ব্রাহ্মণ কুশধ্বজ বললেন, 'আমি অভয় দিচ্ছি. স্বেচ্ছায় আমার আলয়ে প্রবেশ করুন। কার এমন শক্তি আছে যে বলপূর্বক আমার ঘরে ঢুকবে!'

আমি আবার বললাম, 'আপনি ব্রাহ্মণ, আমি দরবেশ; আপনার ঘরে যাই কেমন করে? তাই ভয় পাই।'

আচার্য কুশধ্বজ বললেন, 'অভয় দিচ্ছি; আপনার কোন ভয়

নেই।'—এই বলে আচার্য সাদরে আমাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর যোগীরা বলতে লাগলেন, 'আমাদের প্রধান যোগী জ্ঞাননাথ গেলেন কোথায়? কেউ বললেন, 'আমাদের প্রলুব্ধ করে কোথায় পালিয়ে গেলেন?'

পরদিন সকালে যখন সূর্য উঠেছে তখন আমি আচার্যকে বললাম, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। যোগীরা আমার সম্পর্কে বিবাদ-বিসংবাদ করছেন; তারা হয়ত আপনার উপর উপদ্রব করবেন। তখন আপনি কি করে পরিত্রাণ পাবেন?'

আচার্য জানালেন, 'আমাকে হত্যা না করে কেউ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না। যে ব্যক্তি ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত অথবা শীতার্ত মানুষকে ত্রাণ করেন, তিনি অপরিমিত পুণ্য অর্জন করেন। সুতরাং আপনি যতদিন খুশী থাকুন।'

এভাবে কিছুকাল কাটল। আচার্য কুশধ্বজ মহাপণ্ডিত। তাঁর মুখে শাস্ত্রকথা শুনতে শুনতে দিন যায়। তারপর যোগীরা আমাকে দেখে সকলে মিলে আলোচনা করলেন, 'আমরা সকলে মিলে যার মাংস ভক্ষণ করেছি, সেই লোকই তো আচার্যের বাড়িতে রয়েছে। এর কারণ কি?' যোগীরা আচার্যের বন্দনা করে বললেন, 'আচার্য, এই দরবেশকে আমাদের হাতে উপহার দিন। তার বিনিময়ে আমরা আপনাকে সহস্র মুদ্রা দান করব।'

একথা শুনে আচার্য কুশধ্বজ যোগীদের কঠোর ভাষায় ভৎসনা করলেন। এদিকে আমি তাঁর সঙ্গে নানান শাস্ত্র আলোচনায় কাল কাটাতে লাগলাম। আচার্য আমাকে শাস্ত্রের বহু উপাখ্যান শোনালেন। আমি তাঁকে বললাম, 'ব্রাহ্মণ কখনো প্রাণিবধ করতে পারেন না। তাই যোগীরা আমার কাছে অপ্রিয়। আচার্যদের কাছে

হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেছি। তাই ব্রাহ্মণেরা আমার প্রিয়; দয়ালু ব্রাহ্মণেরা সর্বত্রই রয়েছেন।'

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের একবিংশতি পরিচ্ছেদে সেকের দিগ্বিজয় বর্ণনায় ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কাহিনী সমাপ্ত।

বাইশ

বিপদ্-ভঞ্জন সেক

আমি (সেক) তখন নীলপ্রভা রাজ্যের সজ্জন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসবাস করছি। পূর্ণিমার দিন রাজা জয়প্রতাপ ও কমলসেনী বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করে প্রথমে ব্রাহ্মণদের ভোজন করালেন, তারপর দরবেশ এবং শেষে যোগীদের ভোজন করালেন। মোদক, শর্করাখণ্ড, দধি, পরমান্ন ও বিবিধ পান ভোজনে সকলে খুব তৃপ্ত হলেন।

আমাকে আহার গ্রহণ থেকে বিরত দেখে রাজরানী কমলসেনী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে দরবেশ, আপনি আমার প্রদত্ত খাদ্য খেলেন না কেন? আমার অমর্যাদা করলেন। বলুন, এর কারণ কি?'

আমি উত্তর দিলাম, 'রাজরানী, আমি আপনার অমর্যাদা করছি না। আমি নিজকর্মের অবস্থা বুঝেই খাদ্য গ্রহণ করছি না। আজ যদি আপনার মিষ্টান্ন খাই, তাহলে মনের মধ্যে দুর্নিবার লোভ হবে। কিন্তু কাল তেমন সুখাদ্য কোথায় পাব? অথচ বুনো শাক সর্বত্রই সুলভ হবে। তাই ওগো রাজরানী, মনে অস্বস্তি রাখবেন না। এবার আপনি যান।'

কমলসেনী পুনরায় বললেন, 'আমরা আপনাকে নিত্য সুখাদ্য যোগাব। সুতরাং এখন ভোজন করুন।'

আমি বললাম, 'রাজরানী, এত উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি সোৎসাহে এরূপ খাদ্যদ্রব্য দান করুন। আপনি রাজপত্নী, আপনার ভয় কি?'

তিনি পুনরায় বললেন, 'ওহে বৈদেশিক, একি আমার কর্মফল! জানি না কে আমায় পরিত্রাণ করবেন!'

আমি বললাম, 'রাজরানী, আপনি কাকে ভয় করেন?'

তিনি বললেন, 'তাহলে শুনুন—রাজা ধর্মপ্রতাপের দুই পুত্র ছিল জয়প্রতাপ ও বিজয়প্রতাপ। পিতা দুই পুত্রকে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। উচ্ছলা তরঙ্গিণী গঙ্গা দুই রাজ্যের সীমারেখা। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের শত্রুতা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। তারা পরস্পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কি জানি কার ভাগ্যে পরাজয় ঘটে!'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠাকরুন, বিবাদ থামাতে পারছেন না?'

রাজরানী বললেন, 'বিজয়প্রতাপ সর্বদা আমাদের বিরোধিতা করছেন। তাই শাস্ত্রে বলে—শূদ্রেরা সেবা করবেন, বৈশ্যেরা বাণিজ্য করবেন, আমরা ক্ষত্রিয়েরা শত্রুকে বধ করব এবং সবার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ব্রাহ্মণেরা।' রাজপত্নী আরও বললেন, 'আজ পথে আসতে আসতে এক ভূশণ্ডি কাককে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় দেখেছি; তাছাড়া আপনিও আমাদের দেওয়া খাদ্যদ্রব্য খেলেন না। তাই আপনাকে জানাই আমাদের আজকের দিনটি ভাল যাবে না।'—একথা বলে রানী কমলসেনী কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লেন।

এমন সময় সেই নীলপ্রভা রাজ্যে ভীষণ উপদ্রব শুরু হল। রাজবাড়ীতে আগুন লাগল। লোকজন এদিকে ওদিকে ছুটল। বিজয়প্রতাপ জয়প্রতাপকে বন্দী করলেন। অন্নশালায় যেখানে

কমলসেনী ছিলেন, সেখানে তার স্বামীকে চ্যাং-দোলা করে আনা হল ; উদ্দেশ্য হল বিজয়প্রতাপ কমলসেনীর স্বামীর চোখের সামনেই তাকে ধর্ষণ করবেন। সমস্ত ঘটনা দেখে কমলসেনী আমার পায়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হে বৈদেশিক, আমার প্রাণ যাক, তবু আমার বংশের মর্যাদা রক্ষা করুন।'

রাজা বিজয়প্রতাপ রক্ষীদের আদেশ দিলেন। কমলসেনীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা ছুটে এল। আমি তাদের বললাম, 'ওরে মূর্খের দল, স্ত্রীলোকের কী অপরাধ ?'

আমার কথা শুনে বিজয়প্রতাপ বললেন, 'সেক ও কমলসেনীকে একসঙ্গে ধরে আনো।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, 'এ তো খুব অধর্মের ব্যাপার ! রাজরানী কমলসেনী আমার শরণাগত। আমার সামনে তাকে ধরে নিয়ে যাবে !'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ওরে পাপিষ্ঠের দল, তোরা সব অন্ধ হয়ে যা।'—একথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা ও রাজকর্মচারীরা অন্ধ হয়ে গেল। রাজা বিজয়প্রতাপ দাঁতে তৃণ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললাম। তারপর কমলসেনীকে বললাম, 'ঠাকরুণ, আপনার স্বামীকে বন্ধনমুক্ত করে এখানে আসুন ; এখন আপনার কোন ভয় নেই। বিজয়প্রতাপের সৈন্যরা বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। তারপর বিজয়প্রতাপকে আপনার ইচ্ছামত বেঁধে আমার সামনে হাজির করুন।'

আমার আদেশ পালন করা হলে বিজয়প্রতাপের সৈন্যরা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। রাজা জয়প্রতাপ বিজয়প্রতাপকে হত্যা করতে উদ্যত হলে আমি তাকে নিষেধ করে বললাম, 'মহারাজ· ভাইকে খুন করবেন ? ওকে বন্দী করে রাখুন।'

তখন রাজা জয়প্রতাপ ও রানী কমলসেনী আমার পায়ে পড়লেন। আমি তাদের উঠিয়ে বললাম, 'মহারাজ, একাজ করবেন না। আপনি রাজা, আমি দরবেশ। এমন অনুচিত কাজ করছেন কেন?'

রাজা আমাকে বললেন, 'হে মহাত্মা, আমার কনিষ্ঠ ভাই আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে চ্যাং-দোলা করে আপনার সামনে হাজির করল এবং বলল যে আমার সামনেই কমলসেনীর উপর ব্যভিচার কর! তারপর পতঙ্গের মতো আমার প্রাণসংশয় হল। আমি বড় অপযশের ভাগী হতাম। অবশেষে আপনার অনুগ্রহে সব দিক রক্ষা হল। আপনি যা আদেশ করবেন, তাই শিরোধার্য করব।'

আমি রাজাকে বললাম, 'মহারাজ, আপনার পিতা যথাবিধি রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। কে তার অন্যথা করতে পারে?'

জয়প্রতাপ বললেন, 'হে মহাত্মা, এত বড় নীলপ্রভা রাজ্য আমার নয়; আজ থেকে এ রাজ্য আপনার! আপনি স্বেচ্ছায় ভোগ করুন; আমি আপনার নফর হয়ে থাকব। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।'

আমি বললাম, 'এখন নিজের প্রাসাদে ফিরে যান। জয়বাদ্য বাজাতে বলুন। প্রজারা আপনার অভ্যুদয় ঘোষণা করুক।'

তারপর রাজা জয়প্রতাপ প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান করলেন। সকলে বলল, 'এই মহাত্মার অনুগ্রহে সমস্ত রাজত্ব রক্ষা পেল।'

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদে সেকের দিগ্বিজয় বর্ণনায় জয়প্রকাশের রাজ্যোদ্ধার কাহিনী সমাপ্ত।

তেইশ
জয়-বিজয়ের রাজ্যবণ্টন

তার কিছুদিন পর বিজয়প্রতাপের ভার্যা সোমপ্রভা সংবাদ পেলেন যে তার স্বামী বন্দী হয়ে রয়েছেন; বাঁচেন কি না বাঁচেন এমন অবস্থা। খবর পেয়েই তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকলেন এবং তারপর ধাইমার সঙ্গে বহু ধনসম্পদ নিয়ে আমার কাছে হাজির হলেন। তিনি এসেই আমার পায়ে পড়লেন। তারপর উঠে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হে বৈদেশিক, হে মহাত্মা, আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই? তাহলে কেন আমার স্বামীকে বন্দী করে রেখেছেন? আমি ধনদম্পদ, রাজ্য সব কিছু ছেড়েছি, এখন আপনার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করব, তাই এখানে এসেছি; আপনি বাধা দেবেন না।'

ব্যাপার বুঝে আমি তাকে বললাম, 'রাজরানী শুনুন—যৌবন, ধনসম্পদ, প্রভুত্ব ও বিবেক-বিহ্বলতা এগুলির প্রত্যেকটিই অনর্থের মূল। যেখানে এই চারটিরই সংযোগ হয়, সেখানে কি না ঘটে। আপনার স্বামীর এই চারটিই ছিল। আপনি আমার দোষ দিচ্ছেন কেন? কি চান স্পষ্ট কথায় নির্ভয়ে বলুন।'

তখন সোমপ্রভা বললেন, 'রণভীরু রাজা এবং প্রবাসী ব্রাহ্মণ উভয়েই অন্যের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হন, যেমন ভূমি ও ভূগর্ভস্থ সর্প কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। আমার স্বামী বিজয়ী হলেন, কিন্তু আপনি কেন তাঁর সব আশা বিফল করলেন? অধিকন্তু তাঁর এমন অবস্থা যে বাঁচেন কিনা সন্দেহ। এই রাজ্যের প্রজারাই বলছে যে মহাত্মার কথা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। কিন্তু তিনি বিনা দোষে আমার স্বামীকে বেঁধে রেখেছেন। ভগবান যার যেমন স্বভাব

দিয়েছেন, তিনি তেমন আচরণ করুন। কিন্তু একজনের পাপ অন্যে বহন করবে কেন? আপনি সর্বগুণলক্ষণযুক্ত। কিন্তু এ কেমন বিধান যে একজনকে বন্দী করে অন্যকে রাজ্য দিয়ে মহত্বের অধিকারী করলেন? তাই আপনার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে আপনার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দেব। এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। নতুবা আপনি আমার বাঁচার উপায় বলে দিন। আপনার সাক্ষাতে স্বচক্ষে দেখছি স্বামী বন্দিদশায় আছেন।'

তার কথা শুনে আমি ছল করে বোঝালাম, 'আপনার স্বামীর কি অপরাধ শুনুন—তিনি তার অগ্রজকে হত্যার জন্য বন্দী অবস্থায় চ্যাং-দোলা করে নিজের সম্মুখে হাজির করেছিলেন। তখন জয়প্রতাপেরও প্রাণসংশয় হয়ে উঠেছিল। তারপর সেই জয়প্রতাপ বিজয়প্রতাপকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তাই আমার কাছে দুই ভাইই বিবেকহীন; সুতরাং এরপর আর কোন যুক্তি নেই।'

রাজরানী সোমপ্রভা আবার আমাকে বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, ওঁদের দুজনেরই রাক্ষসী বুদ্ধি, তাই এমন দুষ্কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিলেন।'

আমি বললাম, 'আপনারা সকলের নিকট ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত। এমন রাক্ষসী বুদ্ধি হল কেন?'

তখন সোমপ্রভা বলতে শুরু করলেন—"পূর্বে ত্রেতাযুগে ত্রিলোকবিখ্যাত রাজা রাবণ বাস করতেন। তাঁর পুত্র মেঘনাদ। তিনি রাত্রিকালে রথে চড়ে আমাদের এই দেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং মেঘের মত হুংকার ছাড়তেন। একদিন রত্নপ্রভা নামে আমাদের বংশের এক কুলবধূ সে হুংকার শোনার জন্য ঘরের বাইরে বেরোলেন। মেঘনাদ তাকে দেখেই রথে তুলে নিয়ে আপন দেশের অভিমুখে চললেন। সেই সময় রত্নপ্রভা স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওগো স্বামী, জানি না কে আমাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে চলেছে!'

তারপর রত্নপ্রভার স্বামী উগ্রপ্রতাপ অস্ত্রহাতে মেঘনাদের রথ আটক করলেন। মেঘনাদ তাকেও রথে তুলে নিয়ে দম্পতি সহ ফিরে চললেন। পথের মধ্যে তিনি যখন উগ্রপ্রতাপকে হত্যায় উদ্যত হলেন, রত্নপ্রভা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচান; স্বামীর মৃত্যু হলে আমিও বাঁচব না। আমার বাঁচার কোন পথই থাকবে না। আপনি আমার স্বামীকে জলের মধ্যে পরিত্যাগ করুন।'

রত্নপ্রভার কথা শুনে মেঘনাদ তার স্বামীকে অল্পজলবিশিষ্ট এক জলাশয়ে ফেলে দিলেন। উগ্রপ্রতাপ কোনমতে প্রাণরক্ষা করে ঘরে ফিরলেন। মেঘনাদ রত্নপ্রভাকে অন্তঃপুরে নিয়ে তার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পর তার মা মন্দোদরী মেঘনাদের ঘরে ঢুকেই রত্নপ্রভাকে দেখলেন। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই নারী?'

মেঘনাদ লজ্জা পেয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন। মন্দোদরী রত্নপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? কোত্থেকে এখানে এসেছ?'

রত্নপ্রভা মন্দোদরীর পায়ে পড়ে সমস্ত কাহিনী জানালেন। মন্দোদরী পুত্রের উদ্দেশ্যে রূঢ় ভাষায় ভৎ‍র্সনা করতে লাগলেন, 'ওরে, তুই এখনও তোর পিতার মাতামহের স্বভাব ত্যাগ করতে পারলি না।'

রত্নপ্রভা আবার মন্দোদরীর পায়ে পড়ে বললেন, 'মাগো আমার এখানে মৃত্যুই ভাল।'

মন্দোদরী বললেন, 'বাছা, তুমি এখন কোথায় থাকতে চাও। এখানে থাকবে, না স্বদেশে ফিরে যাবে?'

রত্নপ্রভা বললেন, 'ধর্মময়ী মাগো, আমি স্বদেশে ফিরতে চাই।'

তখন মন্দোদরী স্বেচ্ছাগামী রথকে আদেশ দিলেন, 'হে স্বেচ্ছাগামী রথ, রত্নপ্রভাকে স্বদেশে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এস।'

মন্দোদরীর আদেশ পেয়ে সেই রথ রত্নপ্রভাকে স্বদেশে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। কিছুদিন পরে রত্নপ্রভার এক পুত্র হল।— তাই আমি বলছিলাম যে আমার স্বামী ও ভাশুরের রাক্ষসী বুদ্ধি।"

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠাকরুন, শুনেছি বটে পুরাকালে পুলস্ত্যের পুত্র রাবণ নামে রাজা ছিলেন। কিন্তু তার মাতামহের ব্যাপারটা কি?'

রাজরানী সোমপ্রভা আবার বলতে শুরু করলেন, "মহাতপস্বী পৌলস্ত্য এক সরোবরের তীরে কঠোর তপস্যা কবছিলেন। সেই সময় একদিন সেখানে এক হংস ও হংসী কামক্রীড়ায় মগ্ন হল। তাই দেখে মুনি কামার্ত হয়ে উঠলেন। তখন তিনি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহের অভিমুখে চললেন। পথে এক রাক্ষসী মুনিকে দেখে ভাবল, এই মুনি কামার্ত হয়ে ঘরে চলেছেন। রাক্ষসী পৌলস্ত্যের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে পথে দাঁড়িয়ে রোদন করতে লাগল। উভয়ের সাক্ষাৎ হল।

মুনি পৌলস্ত্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগো, এখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছ কেন?'

ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে রাক্ষসী বলল 'ওগো স্বামী, হে প্রাণেশ্বর গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে তুমি মারা গেছ। আমি মনে মনে ভাবলাম চন্দ্র সূর্য বর্তমান থাকতে আমার স্বামীর মৃত্যু হতে পারে না। তবু মনের দুঃখ গেল না। তাই তোমার পদযুগ দেখতে চলে এলাম। —একথা বলে সেই রাক্ষসী মুনির গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করে কাঁদতে লাগল।

নীলপ্রভা পর্বতে রাবণের জন্মকাহিনীর এই হল সংক্ষিপ্ত ঘটনা।"

বিলাপকারিণী সোমপ্রভার কথা শুনে আমি (সেক) সব ব্যাপার বুঝলাম এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জয়প্রতাপ ও বিজয়প্রতাপ দুই রাজাকেই উপস্থাপিত করলাম। দুই রানী

কমলসেনী ও সোমপ্রভাও এলেন। সকলকে একত্র করে বললাম, আপনারা দুই রাজা পত্নীদের সঙ্গে আমার কথা শুনুন। আমি যেকথা বলব তাই শুনবেন।'

সবাই করজোড়ে বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনার সব কথাই আমরা শিরোধার্য করব। বলুন কি করতে হবে?'

আমি বললাম, 'আপনারা নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখুন।' রাজা ও রানীরা বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তারপর সকলে মিলে ভোজনালয়ে নানান খাদ্যদ্রব্য ভোজন করলেন। আমার কথায় দুই ভাই পরস্পর আলিঙ্গন করে শপথ নিলেন। আমি বললাম, 'আপনাদের পিতা যেভাবে নিয়মমত রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন সেমত গ্রহণ করুন। পূর্ণস্রোতা তরঙ্গিণী গঙ্গা উভয়ের রাজ্যের সীমা, একপাশে নীলপ্রভা রাজ্যের রাজা হোন জয়প্রতাপ এবং অন্যপাশে পীতপ্রভা রাজ্যের রাজা হোন বিজয়প্রতাপ। যতদিন চন্দ্র-সূর্য আকাশে উদিত হয়, ততদিন রাজত্ব করুন। কিন্তু আমার কথা যিনি লঙ্ঘন করবেন, তিনি ধর্মদ্রোহী হবেন এবং আমার অভিশাপে তার উপর বজ্রপাত হবে।'

তারপর বিজয়প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, সমগ্র রাজ্যই আপনার। আমি আপনার চাকর হয়ে থাকব। আপনার উপদেশ না পেলে রাজ্য ও সম্পদের কি প্রয়োজন? নচেৎ আমরা দু' ভাই আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।' জয়প্রতাপ ও বিজয়প্রতাপ পুনঃপুনঃ সেই কথাই বলতে লাগলেন।

সোমপ্রভাও সকলকে সেই কথাই বললেন, 'ভাগ্যে যা ঘটবে, তাই অনুসরণ করব। মহাত্মা সেক যেখানে যেখানে যাবেন, আমিও স্বামীকে সঙ্গে করে সেখানে সেখানে যাব। আমার স্বামী, ধনসম্পদ সবকিছুই উনি রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমারও কর্তব্য আছে।'

অবশেষে তারা সকলে স্বেচ্ছায় অনেক ধনসম্পদ সংগ্রহ করে আনলেন। আমি সব ধনরত্নের হিসাবনিকাশ করে লক্ষ মুদ্রার ব্যয়ে দেশবিখ্যাত এক মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলাম। তারপর সেক বরকতকে ডাকিয়ে এনে তার হাতে মসজিদের দায়িত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করলাম।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদে মহাত্মা সেকের দেশভ্রমণ বর্ণনায় জয়প্রতাপ ও বিজয়প্রতাপের প্রীতি-মিলনের কাহিনী সমাপ্ত।

চব্বিশ

তারপর বিজয়প্রতাপ সস্ত্রীক সেকের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে মহাজ্ঞানী, আমাদের বর দান করুন, অনুগ্রহ করুন। আমার রাজ্যে চলুন, আমি নিজে পাল্কী বহন করব। আপনার কৃপায় সবকিছু রক্ষা পেল।'

আমি তাকে বললাম, 'আপনি স্বরাজ্যে ফিরে যান। আমি সেখানে গিয়ে কি করব?'

সেক বরকত আমার কথা মানলেন না। তিনি বললেন, 'আপনিও চলুন।' রাজা বিজয়প্রতাপ পুনরায় সসম্মানে বললেন, 'মহাত্মাকে অবশ্যই যেতে হবে, নতুবা আমি রাজ্য ত্যাগ করব। আমি আপনার সঙ্গেই যাব।'

আমি চিন্তা করলাম, 'এ কাজ তো ভাল হল না।'

তারপর আমরা সকলে উন্মত্তা তরঙ্গিণী গঙ্গা অতিক্রম করে তার রাজ্যে পৌঁছালাম। পথে যেতে যেতে শূন্য মহানগর চোখে পড়ল। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহারাজ, নগরী এমন জনশূন্য দেখছি কেন? একে যথাযথ পালন করেন নি কেন?'

রাজা বিজয়প্রতাপ বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, এর জন্য আমি দোষী নই। ক্রূণ নামক এক দানব রাত্রিতে এই রাজ্যে এসে তার সেবকদের দ্বারা সকলকে প্রলুব্ধ করে ধন-সম্পদ হরণ করে আর লোকজনদের ধরে নিয়ে যায়। কেউ কেউ প্রজাদের ধরে তাদের রক্ত পান করে। কিন্তু আমি এসবের যথাযোগ্য প্রতিকার করতে পারছি না। সেই কারণেই আমার রাজ্য জনমানবশূন্য, নগরীর এই করুণ দশা। রাত্রির দেরী নেই, তাই আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

আমি রাজাকে তিরস্কার করে বললাম, 'রাজত্ব আপনারই। দানবের ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি এখানেই থাকব, আপনি খুশীমনে ফিরে যান।'

রাজা বললেন, 'আপনি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নেই। সস্ত্রীক আপনার এখানেই থাকব।'

সূর্য অস্ত গেল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল। রাক্ষসরাজ ক্রূণ অনুচরদের সঙ্গে হাজির হলে রাজসৈন্যরা পালিয়ে গেল। রাক্ষসরাজ রথে চড়ে এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি? কোত্থেকে আসছ?'

রাক্ষসরাজ আমাকে বলল, 'তুমি কে? কোন্ দেশ থেকে আসছ? এ-রাজ্য আমার। সসম্মানে এখান থেকে অন্যত্র চলে যাও।'—একথা বলেই সে আমাকে মারতে প্রস্তুত হল। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে আমার আশাদণ্ড দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসরাজের বস্ত্র তার শরীর থেকে মাটিতে খসে পড়ল।

তারপর আমি হুংকার দিলাম। ক্রূণ শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়তেও পারল না। আমার প্রভাব বুঝতে পেরে সে আমার কাছে করুণভাবে বলল, 'হে মহাত্মা, অনুগ্রহ করুন। আপনি যেখানে আদেশ করবেন, সেখানেই চলে যাব।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার পরিচয় কি ?'

সে উত্তর দিল, 'আমি কুবেরের অনুচর, তাঁর সেবক।'

আমি বললাম, 'মহারাজাধিরাজ কুবের ধনাধিপতি ; তিনি তো কখনো অধর্ম আচরণ করেন না। কিন্তু তুমি এভাবে দেশের সর্বনাশ করছ কেন ? কেনই বা মনুষ্যবধ করছ ?'

রাক্ষস পুনরায় বলল, 'হে মহাত্মা, আমি রাক্ষসজাতির স্বভাব অনুযায়ী রক্ত পান করি এবং মনুষ্য, ছাগ প্রভৃতি ভক্ষণ করি। কিন্তু এই দোষে আপনি আমাকে বধ করবেন কেন ? আমাকে ছেড়ে দিন।'

আমি বললাম, 'রাক্ষস, সত্য কথা বলে শপথ কর যতদিন বাঁচবে ততদিন এখানে আর আসবে না।'

রাক্ষস ক্রূণ সত্যের নামে শপথ করে পলায়ন করল। এই ঘটনা জানার পর বিজয়প্রতাপ আমাকে বললেন, 'হে মহাত্মা, আজ থেকে আমি আপনাকে সপ্ত যোজন ভূমির মালিক করলাম।'

তারপর আমি নিজের নাম অনুসারে সেই ভূমির নামকরণ করলাম। সংবাদ শুনে বহু লোকজন বাসভূমির সন্ধানে আমার কাছে আসতে লাগল। সপ্তযোজন ভূমি বিভক্ত করে বাসের উপযুক্ত পরিমাণ জমি জনে জনে দান করলাম। ইন্দ্রের অমরাবতীর মত দেশ লাভ করে সকলে সেখানে বসবাস করতে লাগল। আমি তাদের বললাম, 'পাহাড় থেকে পাথর বহন করে এখানে সংগ্রহ কর।

লোকজন জানাল, 'পর্বতের দ্বারে পিঙ্গল ও দদ্রু'র নামে দুই

হাতী বাস করে ; তারা দুই ভাই। মানুষের এমন কোন শক্তি নেই যে সেই পর্বতে প্রবেশ করে। ঐ দুই হাতী মানুষকে কীটবৎ হত্যা করে। পাহাড় থেকে পাথর জোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমি বললাম, 'আমিও সেখানে যাব।'

রাজা বিজয়প্রতাপ সৈন্যদের নিয়ে আমার সঙ্গে সেই পর্বতে উপস্থিত হলেন। দ্বারদেশে দুই হাতীকে দেখে সৈন্যরা পালিয়ে গেল। তখন আমি আশালগুড় হাত থেকে নামিয়ে আমার জাতিধর্ম নামাজ পাঠ করতে শুরু করলাম। এই সুযোগে দদ্রুর হাতী এসে আমার আশাদণ্ড তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার শুঁড় ছিন্ন ভিন্ন হল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে পিঙ্গল হাতীটি ক্রুদ্ধ হয়ে আশাদণ্ড ভেঙ্গে ফেলার জন্য শুঁড় দিয়ে সেটি পিঠের উপর তুলে নিল। তৎক্ষণাৎ তার পিঠ বিদীর্ণ হল। এভাবে দুই হাতী মারা পড়ল।

সেই পর্বতের অভ্যন্তরে হংসার্ণব রাজ্য বিদ্যমান। কিন্তু সেখানে কেউ একা একা যেতে পারে না ; তাহলে অমঙ্গল ঘটে। সেখানকার রাজা শুভপ্রতাপ শুনলেন যে সেক পর্বতদ্বারের দুই হাতীকে হত্যা করেছেন। রাজা শুভপ্রতাপ সস্ত্রীক আমাকে দেখতে হাজির হলেন। এসেই তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে আপনি, কোত্থেকে আসছেন?'

তিনি বললেন, 'আমি রাজা শুভপ্রতাপ। আমার স্ত্রী রত্নপ্রভা। আমি মহাত্মার দর্শনাভিলাষী। আপনি আমার রাজ্যের দুই আপদ-বালাই হাতী দুটিকে হত্যা করেছেন। অতএব আপনি রাজ্যের মালিক। আপনি এ' রাজ্য খুশীমত ব্যবহার করুন।'

আমি তাকে বললাম, 'এখন জাতিধর্ম নামাজ পাঠ করব।

আপনি এখানে থাকুন। নামাজপাঠ শেষ হলে আমি নিকটবর্তী হংসকেলি সরোবরে মুখ ধুতে গেলাম। কিন্তু রাজা আমাকে নিষেধ করে বললেন, 'হে মহাজ্ঞানী, বজ্রদংষ্ট্র নামে এক গোসাপ ঐ জলে থাকে। সরোবরের জল স্পর্শ করলেই ঐ গোসাপ আপনাকে ধরে টানতে টানতে জলের ভিতর নিয়ে যাবে।'

আমি তাকে তিরস্কার করে বললাম, 'হতবুদ্ধি রাজা, গোসাপকে ভয় পাচ্ছেন! অথচ আপনি কিনা রাজ্য পরিচালনা করেন।' —এই বলে আমি সরোবরের জল স্পর্শ করলাম; গোসাপ আমাকে আক্রমণ করলে আমি তাকে হাত দিয়ে ধরে পর্বতের দ্বারে ছুঁড়ে ফেললাম। বজ্রদংষ্ট্র মারা গেল।

সকলে বলল, 'ধন্য এই মানুষ, যিনি আমাদের বিপদ দূর করলেন। এবার সুখে জল খেতে পারব।'

সমগ্র ঘটনা দেখে রাজা ও রানী আমার পায়ে পড়লেন। আমি উভয়কে উঠিয়ে বললাম, 'মহারাজ, আপনি সস্ত্রীক আমাকে প্রণাম করছেন কেন? এমন অনুচিত কাজ করছেন কেন? আপনি স্বেচ্ছায় যেতে পারেন।'

রাজা শুভপ্রতাপ বললেন, 'মহাত্মা আপনার কৃপায় রাজ্যনাশা দুই হাতী মরল, আবার বজ্রদংষ্ট্র গোসাপও মরল। সুতরাং আপনি আমার রাজ্যেই থাকুন। আজীবন চেষ্টা করে যা পারি নি, আপনি মুহূর্তের মধ্যেই তার সমাধান করলেন। তাই প্রজারা বলছে যে আমি আপনার উপযুক্ত গুণগান করেছি।'

এই ঘটনার পর এক কাক সেই গোসাপটিকে ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে হংসার্ণব রাজ্যের সুবেল নামক পর্বতের উপর উড়ে এসে বসল। সেই কাকের পাদুটি বৃহদাকার নারকেল গাছের মত লম্বা এবং ঠোঁটদুটি আরও বড়। কাককে দেখে রাজার সৈন্যেরা পালিয়ে গেল। কাক পাহাড়ের উপর থেকে আমাকে দেখতে লাগল। কিন্তু আমি যেই তাকে আমার আশাদণ্ড

দেখালাম, তৎক্ষণাৎ সে যে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই গাছটি সমূলে ভেঙ্গে পড়ল।"

তারপর রানী রত্নপ্রভা আমাকে নানান ঘটনা দেখালেন এবং বললেন, 'এসব কারণেই আমাদের দেশটি বাসযোগ্য নয়। কথিত আছে যে চটক পাখী যদি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এই সুবেল পাহাড়ের উপর তা ভক্ষণ করে, তাহলে অবশ্যই কোন বিপদ-আপদ ঘটবে। পাহাড়ে এসে পৌঁছালে পর এই পাখীরা যা সামনে পায়, তাই খায়। আজ যদি মহাত্মা এখানে উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে তারা একে একে আমাদের সকলকে ভক্ষণ করত। কিন্তু সমুদ্রের মাছগুলি পাখনা দিয়ে জল ছুঁড়তে শুরু করল এবং জলের শব্দ শুনে তীরের পাখীরা সব পালিয়ে গেল। তারপর রাজদ্বারে উচ্চরবে বাদ্য বেজে উঠল। তা না হলে সমস্ত লোকজন বধির হয়ে যেত। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের জায়গাটি পাতালের মত দেখায়। সেই খাদ দেখে বড় বড় পাখীরা পাহাড়ের উপর উড়ে আসতে পারে না। যখনই কোন পাখী এখানে এসে বসার চেষ্টা করে, তখনই পাহাড়ের চূড়ায় গাছের ডালে দুটি চটক পাখী হাজির হয় এবং সেই কারণেই কোন পাখী এখানে আসতে সাহস পায় না। আমি আপনাকে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানালাম। এসব কারণে এদেশ খুবই বিপজ্জনক। আর কি বলব। এবার আপনি বলুন।'

আমি বললাম, 'ভাল এবং মন্দ সর্বত্রই আছে।'

তারপর আমি সেই দেশে এক মসজিদ নির্মাণ করিয়ে নিজের নাম অনুসারে তার নামকরণ করে রাজ্যের নামকরণ করলাম সেক-জলাল তাব্রেজী রাজ্য। সেদেশ থেকে অত্যন্ত কষ্টে আমি এই রাজ্যে পৌঁছেছি। সংক্ষেপে এই হল আমার (সেকের) কাহিনী।"

রাজা লক্ষ্মণসেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাত্মা, সেই দেশে কি কি বস্তু সুলভ এবং কি কি দুর্লভ?'

আমি বললাম, 'মহারাজ শুনুন, সেদেশে ঘি দিয়ে রান্না মুখরোচক খাদ্য সুলভ; পায়স ও দধি এবং গম ও যবের ঘিয়ে-ভাজা পিঠা সুলভ। তবে তণ্ডুল ও নারকেল সুলভ নয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা সে-সব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেন না; তাঁরা সকলে দেবধান্য এবং পার্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন বিবিধ ফল ভক্ষণ করেন। এই দুই বর্ণের ক্ষেত্রেই এরূপ বিধান।'

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থের চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে সেকের দিগ্বিজয় বর্ণনায় রাজা বিজয়প্রতাপের কাহিনী সমাপ্ত।

পঁচিশ

রাজ্যসভায় কে বড়—
রাঢ়ী না বারেন্দ্রী তন্তুবায়?

এক সময় রাঢ় ও বারেন্দ্র দেশের তন্তুবায় সম্প্রদায় রাজদ্বারে উপস্থিত হল। রাজাকে প্রণাম নিবেদন করে তারা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা দুই দেশের তন্তুবায় সম্প্রদায়। উভয়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় রাজার কাছে প্রথম তাম্বূল গ্রহণের অধিকারী?'

একথা শুনে রাজা মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্ত্রী, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? যারা শ্রেষ্ঠ তাদের আগে তাম্বূল দান কর।'

ব্যাপার বুঝে মন্ত্রী বললেন, 'ওহে তন্তুবায়গণ আজকের দিনটি অপেক্ষা করুন। আগামী কাল আসুন। তখন আপনাদের মধ্যে যারা প্রথম তাম্বূল গ্রহণের যোগ্য তাদের হাতেই দান করব।'

উভয় সম্প্রদায় মন্ত্রীর কথায় সম্মত হল। পরদিন প্রাতঃকালে

সকলে মন্ত্রীর বাড়ীতে হাজির হলে মন্ত্রী বললেন, 'আপনারা সকলে তাম্বূল, সন্দেশ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে চলুন।'

তন্তুবায়গণ মন্ত্রীর কথামত কাজ করলেন। তারপর তারা গঙ্গায় স্নান করে মন্ত্রীর সম্মুখে হাজির হলেন। এই সময় অনেক রাজপুত সেই পথে যেতে যেতে মন্ত্রীকে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করলেন। তখন রাঢ়দেশীয় তন্তুবায়গণ তাদের দল-নেতাকে বললেন, 'ওহে বসাক, আপনাকে প্রণাম জানিয়ে যে ব্যক্তিটি চলে গেলেন, তিনি কে?'

বসাক উত্তর দিলেন, 'আমি জানি না।'

পুনরায় বারেন্দ্রদেশীয় তন্তুবায়গণ তাদের দলনেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে বসাক, আপনাকে প্রণাম জানিয়ে যে ব্যক্তি প্রস্থান করলেন, তিনি কে?'

সেই বসাকও বললেন, 'তোমরা শোন সেই ব্যক্তি কে তা আমি জানি না।'

তারপর সকলে আলোচনা করলেন, 'যিনি মহৎ ব্যক্তি, তাঁর পক্ষে সকলকে চিনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সকলে তাঁকে চেনেন।' উভয় পক্ষই এরূপ আলোচনায় ব্যস্ত রইল। দুই দলনেতা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্ত্রী, বলুন উভয়ের মধ্যে কে প্রথম তাম্বুল গ্রহণের যোগ্য?'

মন্ত্রী বললেন, 'ওহে তন্তুবায়গণ, আপনাদের দুই ব্যক্তির যিনি প্রথম ঐ পথিকের প্রণাম লাভ করেছেন, তাকেই প্রথম তাম্বুল দান করা হবে। সুতরাং ঐ পথিককে ধরে আনুন।

একথা শুনে চারজন তন্তুবায় সত্বর যাত্রা করলেন। কিন্তু সেই পথিক তাদের দেখেই পালিয়ে যেতে লাগলেন। তন্তুবায়েরা তাকে বলতে লাগলেন, 'ফিরে আসুন, পালিয়ে যাচ্ছেন কেন।'

কিন্তু পথিক তাদের দেখে ভাবলেন, 'এরা নিশ্চয় কোন কারণে আমাকে ধরতে আসছে।'

পথিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি কারণে আমাকে ধরতে চান ?'

তারপর তিনি এক গ্রামে হাজির হয়ে কোতোয়ালকে বললেন, 'ওহে কোতোয়াল, চারজন লোক আমাকে ধরতে আসছে। কিন্তু তারা কে আমি জানি না। তাই আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি ; আমার প্রাণ রক্ষা করুন।'

এমন সময় সেই চারজন তন্তুবায় সেখানে হাজির হয়ে ঐ পথিককে ধরতে উদ্যত হলেন। কোতোয়াল বললেন, 'ওহে পাপিষ্ঠের দল, একে ধরতে এসেছ কেন ?'

কোতোয়ালের কথায় তন্তুবায়গণ পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কোতোয়াল তাদের প্রধানকে ঘটনা জানালে তিনি আদেশ দিলেন, 'এই চারজনকে হাতে ও গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ। এরা হল দস্যু।'

তন্তুবায়দের ফিরতে দেরী হওয়ায় মন্ত্রী সেদিন রাজসভায় হাজির হতে পারলেন না। পথে যাতায়াতের সময় জনসাধারণের মুখে শোনা গেল যে, রাজার কোতোয়াল চারজন তন্তুবায়কে হাতে ও গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন ; কিন্তু তাঁদের কি দোষ তা জানা যায় নি।

মন্ত্রী অন্যান্য তন্তুবায়গণকে জানালেন, 'ওহে তন্তুবায়গণ, ঐ চারজন বিনা দোষে বন্দী হয়েছেন। আমি এই সংবাদ পেয়ে রাজার কাছে নিবেদন করতে চলেছি।'

একথা বলে মন্ত্রী যাত্রা করলেন। তার পিছনে অন্যান্য তন্তুবায়গণ চললেন। রাজাকে সেই সংবাদ জানান হল। রাজা কোতোয়ালকে আনতে দূত পাঠালেন।

কোতোয়াল হাজির হলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চারজন তন্তুবায়কে বিনা দোষে বন্দী করেছ কেন ?'

কোতোয়াল রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সমস্ত ঘটনা

নিবেদন করলেন। তার কথা শুনে রাজার সভাসদেরা সজোরে হেসে উঠলেন। তারপর সেকের সমক্ষে মন্ত্রী বললেন, 'তাহলে সেই পথিককে নিয়ে আসুন।' পথিক হাজির হলে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে রাজপুত পথিক, পথে যাওয়ার সময় আপনি কোন্ তন্তুবায় দলপতিকে প্রথমে প্রণাম জানিয়েছিলেন? আপনি এ-প্রশ্নের উত্তর দিন।'

প্রশ্ন শুনে সেই রাজপুত মাটিতে আছড়ে পড়ে নিজেই নিজেকে আঘাত করলেন। ব্যাপার দেখে সেক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কেমন ব্যাপার যে, লোকটি নিজেই নিজেকে আঘাত করছে? এ কি উন্মত্ত? মহারাজ, তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মজার কাহিনী শুনতে চাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রী সম্প্রদায়ের শুভাশুভ কথা বর্ণনা করুন।'

তখন রাজপুত বলতে শুরু করলেন, 'একদা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রী সম্প্রদায়ের তন্তুবায়গণ মন্ত্রীর সঙ্গে অবস্থান করছিল। সেই সময়ে আমি গঙ্গায় স্নান করে বাড়ী ফিরছিলাম। পথে যেতে যেতে মন্ত্রীকে দেখে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে পথ চলতে লাগলাম। তখন মন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে—আমি দুই তন্তুবায় প্রধানের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির উদ্দেশে নমস্কার জানিয়েছি? আপনার সাক্ষাতে মন্ত্রী আমার জাতিনাশ করছেন।'—একথা বলেই রাজপুত মাটিতে শুয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা রাজপুতকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু রাজপুত কিছুতেই শান্ত হলেন না। তিনি রাজাকে অপবাদ দিয়ে বললেন, 'আমি আপনার সজাতীয়। সুতরাং আপনি ঠিক কথা বলেন নি।'

তখন রাজা ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, 'তন্তুবায়দের দলপতিকে আটক কর।'

রাজার আদেশ শুনে অন্যান্য তন্তুবায়গণ পলায়ন করলেন।

বিদ্যুৎপ্রভার চাতুরী

পরদিন প্রাতঃকালে জনৈক তন্তুবায় পাঁচটি পুরান কড়ি সম্বল করে গলায় চাঁপার মালা ঝুলিয়ে রাজদরবারের অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে পিঁপুল গাছের তলায় বসে বিদ্যুৎপ্রভা নামে এক নর্তকী হাওয়া খাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয় তন্তুবায়। বিদ্যুৎপ্রভা তার কাছে গিয়ে বললেন, 'তন্তুবায়, তোমার চাঁপার মালাটি আমাকে দাও।'

তন্তুবায় মালা দিতে রাজী হলেন না। বিদ্যুৎপ্রভাও বারবার মালা চাইতে লাগলেন। পথে লোকজন জমা হয়ে গেল। তারা তন্তুবায়কে বলল, 'মালাটি দেওয়া উচিত।'

তবু মালা না দেওয়াতে বিদ্যুৎপ্রভা তন্তুবায়কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলপূর্বক তার কাছ থেকে মালা কেড়ে নিলেন। তন্তুবায়ও লজ্জায় মালা দান করলেন। তিনি রাজার কাছে গেলেন। বিদ্যুৎপ্রভাও তার পশ্চাতে চললেন। উভয়েই রাজদ্বারে হাজির হলেন। নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা তন্তুবায়ের কোমর ধরে রাজার নিকট বিচারের অঙ্গীকার চাইলেন। উভয়কে দেখে সকলেই উচ্চকণ্ঠে কোলাহল করে উঠল।

কোলাহল শুনে সেক বললেন, 'কেউ যেন চীৎকার করছে। তাকে ধরে আন।'

নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে তন্তুবায়কে রাজদরবারে হাজির করা হল। সকলের চোখের সামনে বিদ্যুৎপ্রভা তন্তুবায়ের কোমর ধরে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। উভয়কে দেখে রাজসভার সকলে সজোরে হেসে উঠলেন।

রাজা বললেন, 'পাপীয়সী, কেন তুমি আমার প্রজা ঐ তন্তুবায়ের কোমর ধরে রয়েছ। ওকে সত্বর ছেড়ে দাও।'

নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'মহারাজের এই গ্রামবাসী তন্তুবায়

প্রজাটি পাঁচ কড়ি দানের অঙ্গীকার করে আমার সঙ্গ উপভোগ করে, কিন্তু পরে আমি পণ চাইলে সে অস্বীকার করছে। সুতরাং এর প্রতি মহারাজের যদি দয়া হয়, তাহলে আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে একে মুক্ত করুন।'

তখন মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে তন্তুবায়, প্রকৃত ঘটনা বল। তুমি কি নর্তকীর সঙ্গে সহবাস করেছ?'

তন্তুবায় করজোড়ে বললেন, 'হে মন্ত্রী. ইনি আমার সম্পর্কে সবকিছু মিথ্যা বলছেন।'

নর্তকী বললেন, 'মহারাজ, তন্তুবায়কে আমার চাঁপার মালা ফিরিয়ে দিতে বলুন, সে মালা ভালই হোক বা মন্দই হোক।'

তন্তুবায় মালা দান করতে সম্মত হলেন না। রাজা তাকে বললেন, 'যাচককে মালা দিতে দোষ কি?'

নর্তকী পুনরায় অভিযোগ করলেন, 'আমার সঙ্গে সহবাস করার ফলে আমার শরীরের গন্ধ ওর গায়ে লেগে আছে। আপনি বিচার করুন।'

রাজা ভৃত্যকে আদেশ করলেন, 'তন্তুবায়ের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখ। তারপর যদি নর্তকীর অভিযোগ সত্য হয় তাহলে এর সমাধান হবে।'

রাজভৃত্য তন্তুবায়ের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করে সুগন্ধির আঘ্রাণ পেল। সে রাজাকে জানাল, 'গন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তার কারণও প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। আপনি স্বয়ং দেখুন।'

তারপর নর্তকী বলপূর্বক তন্তুবায়ের কাছ থেকে পাঁচ কড়ি ছিনিয়ে নিলেন। সকলে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। অবশেষে তন্তুবায় ও বিদ্যুৎপ্রভা উভয়েই নিজ নিজ ঘরে ফিরলেন।

পরদিন রাজা সব তন্তুবায়কে একত্র আনিয়ে বললেন, 'তোমরা সকলে উত্তমভাবে রান্নাবান্না কর। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভোজন কর।'

অতঃপর রাজা পরিচারকদের আদেশ করলেন, 'তন্তুবায়দের পাককার্যের জন্য প্রয়োজনীয় তণ্ডুলাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের জোগাড় করে দাও এবং তাছাড়া দশটি খাসি ছাগল দাও। তারপর তন্তুবায়গণ রান্না করবে।'

ছাগরক্ষক বলল, 'দশটি ছাগল কোথেকে জোগাড় করি?'

তার কথা শুনে তন্তুবায়গণ বললেন, 'ওহে আমরা রাজাকে ছাগলের লেজগুলি দেখাব। তখন তুমি শুধু সম্মতি জানাবে।'

সেই সময় সভায় গাঙ্গো নট হাজির ছিলেন। রাজা তাকে বললেন, 'ছাগলগুলি কাটা হলে তুমি লেজগুলি ভাঁড়ের মধ্যে সংগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'—এই বলে রাজা তন্তুবায়গণকে যথাস্থানে পাঠালেন।

তারপর গাঙ্গো নট চালাকি করে ভাঁড়ের ভিতর ছাগলের লেজের সঙ্গে একটি কুকুরের লেজ ভরে দিলেন। ভোজন শেষ হলে তন্তুবায়গণ রাজসভায় ফিরলেন। তারা রাজাকে বললেন, 'হে মহারাজাধিরাজ, বিজেতা শাসক, আপনার অনুগ্রহে নানাবিধ ভোজ্য, মৎস্য-মাংস এবং বিবিধ ব্যঞ্জন গ্রহণ করলাম। আপনাকে চির অভিনন্দন জানাই।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'খাসির মাংস কেমন খেলে?'

তন্তুবায়গণ বললেন, 'ভাঁড় থেকে লেজগুলি বের করে দেখলেই তা বুঝবেন।'

তখন গাঙ্গো নট ভাঁড় থেকে লেজগুলি মাটিতে রাখলেন এবং সেগুলি একে একে গুণতে শুরু করলেন। মোট দশটি লেজ। কিন্তু তার মধ্যে একটি লেজ বাঁকানো। সেটি সোজা করে দিলেও পূর্ববৎ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সকলে বিচার করে বুঝলেন সেটি কুকুরের লেজ।

গাঙ্গো নট রাজাকে জানালেন, 'মহারাজ, এর মধ্যে কুকুরের লেজ পাওয়া গেছে।'

রাজা তাকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ওহে পাপিষ্ঠ, এরূপ ঘটনা কি কখনো ঘটে যে তন্তুবায়েরা কুকুরের মাংস ভোজন করে। ঠিকভাবে লক্ষ্য কর।'

গাঙ্গো নট জানালেন, 'একখানি থান ইঁট এর উপর চাপিয়ে রাখলেও পরমুহূর্তেই লেজ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, কখনো সরল থাকছে না।' তার কথা শুনে সকলেই হাসতে শুরু করল। তন্তুবায়গণ চুপ করে রইলেন।

পরদিন সকালে রাজা তন্তুবায়গণকে রাজপ্রাসাদে আনিয়ে ঘি-মাখানো কাঁঠাল খাওয়ালেন। ভোজন শেষ হলে সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরলেন।

সেই দিনই রাত্রিতে তন্তুবায়গণ এক সভায় একত্র মিলিত হলেন। তারা সকলে একমনে স্বীকার করলেন, 'রাজসভায় আমরা অপমানিত হয়েছি। সুতরাং আমরা কেউই স্বীকার করব না যে রাজা আমাদের ঘি-মাখানো কাঁঠাল খাইয়েছেন।'

কিন্তু সেই সভায় গাঙ্গো নটের পুত্র জয়নট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ওহে, তোমরা সবাই আমার সম্মুখে ঘি মাখানো কাঁঠাল খেলে ; কিন্তু এখন তা অস্বীকার করতে চাইছ কেন ?'

সকলে তাকে তিরস্কার করে বলে উঠলেন, 'ওহে পাপিষ্ঠ নট, আমাদের কথায় সম্মত হচ্ছ না কেন ?'—একথা বলে তারা সকলে জয়নটের চুল ধরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সামান্য আঘাতেই তিনি মৃতবৎ পড়ে রইলেন।

তখন তন্তুবায়গণ পরস্পর বললেন, 'যদি এই পাপিষ্ঠ জয়নটের মৃত্যু ঘটে এবং রাজা তা জানতে পারেন, তাহলে তিনি আমাদের কাছে এর ওজনের সমান সোনাদানা আদায় করবেন।'

জয়নট যখন মরার মত মাটিতে পড়ে রইলেন, সেই সময় তার স্ত্রী নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা সেখানে হাজির হয়ে স্বামীকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি নানানভাবে বিলাপ করলেন, 'ওগো

প্রাণেশ্বর ! আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলে। তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচব না !'

অতঃপর বিদ্যুৎপ্রভা তার পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজার সম্মুখেই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হে মহারাজাধিরাজ, 'তন্তুবায়েরা মিলিত হয়ে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। তারা রাজার নামে অঙ্গীকার করে বলেছে নটের মৃত্যু হলে রাজা তার ওজনের সমান ধনরত্ন তন্তুবায়দের কাছে আদায় করবেন।'

তারপর রাজা সব তন্তুবায়কে ডেকে বললেন, ওহে তন্তুবায়গণ, তোমরা জয়নটকে হত্যা করেছ কেন ?'

তন্তুবায়গণ বললেন, 'মহারাজ আমরা সকলে মিলে যে অভিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এই জয়নট তা মানতে রাজী হন নি। তাই আমরা একে হত্যা করেছি। মহারাজ যদি আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা এর ওজনের সমান ধনরত্ন দিতে প্রস্তুত আছি।'

মন্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের কথাই ঠিক। ওহে তন্তুবায়গণ এর সমপরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে এস।'

তারপর তন্তুবায়গণের যার যা ধনরত্ন ছিল, সকলে তাই নিয়ে হাজির হলেন। সমস্ত ধনরত্ন জড়ো করা হলে রাজা বললেন, 'প্রত্যেকের ধনরত্ন পৃথক পৃথক রাখ।'

বিদ্যুৎপ্রভা হাজির হয়ে বললেন, 'মহারাজ আমার স্বামীকে কোথায় পাব ? উনি তো এখন মৃত।'

রাজা বললেন, 'পাপীয়সী, তোমার স্বামীর ওজনের সমপরিমাণ সোনাদানা গ্রহণ কর।'

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'মহারাজ, স্বামীকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচব না। বিশেষত স্বামী ছাড়া রাত্রিযাপন অসম্ভব। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, এখন কে আমার স্বামী হবেন ?'

বিদ্যুৎপ্রভা তন্তুবায়গণকে পুনঃ পুনঃ একই কথা বললেন। কিন্তু কেউই তাঁর স্বামী হতে সম্মত হলেন না। তখন জনৈক তন্তুবায় এগিয়ে এসে বললেন, 'পাপীয়সী, নর্তকী, আমাদের কাকে স্বামী করতে চাও? যাকে খুশী গ্রহণ কর।'

মন্ত্রী বললেন, 'বিদ্যুৎপ্রভা, এদের মধ্যে যাকে পছন্দ, তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ কর।'

বিদ্যুৎপ্রভা জনৈক তন্তুবায় যুবকের কোমরে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে চললেন। তারপর নর্তকী নিভৃতে কাপড়ের পর্দার ভেতর সেই যুবককে বললেন, 'ওহে তন্তুবায়, আমাকে স্বেচ্ছায় উপভোগ কর।'

তন্তুবায় যুবক লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আমি জানি না।'

তারপর সেই যুবককে পরিত্যাগ করে বিদ্যুৎপ্রভা অন্য এক যুবককে নিয়ে এসে পূর্ববৎ অনুরোধ করলেন। সেই যুবকও পূর্বের যুবকের মতই বললেন। তাদের কথাবার্তা শুনে অন্যান্য সকলে হাসতে শুরু করলেন।

অতঃপর বিদ্যুৎপ্রভা সকলকে বললেন, 'ওহে সভাসদ্‌গণ, এই তন্তুবায়েরা নারীসঙ্গ করতে অক্ষম। তাহলে কি উপায়ে আমি পুত্র জন্ম দেব?'

উপস্থিত কোন ব্যক্তিই বিদ্যুৎপ্রভার এই অশ্লীল কথাবার্তা সহ্য করতে পারলেন না। রাজা আদেশ দিলেন, 'এই পাপীয়সীর কানের গোড়ায় এক চড় বসিয়ে দাও।'

কিন্তু ভয়ে কেউই তাকে চড় মারতে সাহস পেল না। বিদ্যুৎপ্রভা মন্ত্রীর সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাজা আদেশ করেছেন আমার কানের গোড়ায় চড় মারতে।'

কথা শুনে মন্ত্রী পালিয়ে গেলেন। নর্তকী ব্রাহ্মণদের কাছে হাজির হয়ে তাদের কোলে বসে পড়তে উদ্যত হলেন। দেখে ব্রাহ্মণেরা পালিয়ে বাঁচলেন। তারপর নর্তকী রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে [illegible] 'মহারাজ, আপনার আদেশমত কেউ

আমাকে চড় মারতে সক্ষম হলেন না। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি প্রস্তুত হয়ে আমাকে স্বেচ্ছায় মারুন।

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, 'সেক এখানে অনুপস্থিত, তাই পাপীয়সী আমাদের এমনভাবে লজ্জা দিতে পারল।'

বিদ্যুৎপ্রভা বললেন, 'আমি সেই মহাত্মাকে দর্শন করেছি; কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয়নি।'

সেক এসে বললেন, 'বিদ্যুৎপ্রভা, তুমি একাজ করে কি সুখ পেলে? আমাদের এভাবে লজ্জা দিলে কেন?'

নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা সেককে সেলাম করে বললেন, 'হে মহাত্মা, আমি আপনার কথায় খুব খুশী হয়েছি।'

সকলেই বুঝলেন এবং সেককে বোঝালেন যে এই বিদ্যুৎপ্রভা বারবধূ।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে বিদ্যুৎপ্রভার সংলাপ নামক কাহিনী সমাপ্ত।

মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে এই পুস্তকের অনুলিপি সমাপ্ত হোল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী তিথি ভৃগুবাসরে। শ্রীরামভদ্র শর্মা শ্রীজগন্নাথ রায়ের পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত সাহজালালের জনচিত্তহারী গল্পকাহিনীর গ্রন্থ নকল করেন। ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিনে এই শুভোদয়া পুঁথি লিখিত হল। শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম।

মুসলমান সন ৬০৮, বিক্রমাদিত্য শক ১১৩৪ সাল কার্তিক মাসে মহাত্মা সাহজালাল আশ্রমে আগমন করেন। শ্রীহরি। মুসলমান সন ৬১০, বিক্রমাদিত্য শক ১১৩৬ সাল চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে চান্দ্র রজব মাসে মহাত্মা শাহজালাল এদেশ থেকে গমন করেন।

শুভমস্তু।